ইউনিট-১০

বিদ্যালয় পরিচালনা ও বিষয় শিক্ষক

অধিবেশন-১ : একাডেমিক পরিকল্পনা, শিক্ষাদান পরিকল্পনা ও সময়সূচি

অধিবেশন-২ : তত্ত্বাবধান

অধিবেশন-৩ : পেশাগত উন্নয়ন

অধিবেশন-৪ : পরীক্ষা

অধিবেশন-৫ : বিদ্যালয়ভিত্তিক মূল্য যাচাইয়ের প্রতিবেদন প্রণয়নের আবশ্যক প্রক্রিয়া

ইউনিট -১০ **অধিবেশন-১**

একাডেমিক পরিকল্পনা, শিক্ষাদান পরিকল্পনা ও সময়সূচি

ভূমিকা

শিশুর দেহ, মন, আত্মা এবং তার অন্তর্নিহিত শক্তি ও সম্ভাবনাগুলোর বিকাশ ঘটিয়ে তাকে জীবনে সুপ্রতিষ্ঠিত হওয়ার লক্ষ্যে তার রুচি ও আগ্রহ অনুযায়ী দক্ষ ব্যক্তি হিসেবে গড়ে তুলে দেশ ও জাতির জন্য সম্পদে পরিণত করাই শিক্ষার লক্ষ্য। মাধ্যমিক বিদ্যালয়ের সমগ্র কর্মকান্ড-কে সাধারণত তিন ভাগে ভাগ করা যায়। যথা- (১) প্রশাসনিক, (২) একাডেমিক ও (৩) উন্নয়ন। এই তিনটি বিভাগের সুষ্ঠু পরিকল্পনার উপর নির্ভর করে মাধ্যমিক বিদ্যালয়ের অগ্রগতি। বিদ্যালয়ের শিক্ষাক্রমিক ও সহশিক্ষাক্রমিক এবং তৎসংশ্লিষ্ট কার্যাবলি একাডেমিক কর্মকান্ড হিসেবে চিহ্নিত। মাধ্যমিক বিদ্যালয়ের একাডেমিক ব্যবস্থাপনায় সামগ্রিক কার্যকলাপ নির্ধারিত সময়ের মধ্যে সুষ্ঠু ও উদ্দেশ্যানুগভাবে সম্পন্ন করার জন্যে যে সব সিদ্ধান্ত গ্রহণ করা হয় তাকে একাডেমিক পরিকল্পনা বলা হয়। অর্থাৎ বিদ্যালয়ে শিক্ষাক্রম বাস্তবায়ন সম্পর্কিত সমগ্র কাজ কখন, কীভাবে, কাদের মাধ্যমে সুচারুরূপে সম্পাদন করা হবে এ সম্পর্কিত পূর্বে তৈরি ধারাবাহিক প্রক্রিয়ার রূপরেখাই হলো একাডেমিক পরিকল্পনা। বিদ্যালয়ের একাডেমিক পরিকল্পনার প্রধান উপাদান তিনটি - (১) বার্ষিক কর্ম-পরিকল্পনা, (২) পাঠ-পরিকল্পনা ও (৩) ক্লাস রুটিন।

এ বিষয়ে আমরা এ অধিবেশনে বিস্তারিত আলোচনা করব।

উদ্দেশ্য

এ অধিবেশন শেষে আপনি–

- একাডেমিক পরিকল্পনার সংজ্ঞা ও এর উপাদান বর্ণনা করতে পারবেন।
- বার্ষিক পাঠ-পরিকল্পনার সংজ্ঞা ও প্রয়োজনীয়তা ব্যাখ্যা করতে পারবেন।
- মাধ্যমিক বিদ্যালয়ের ক্লাস রুটিন তৈরির নীতি বর্ণনা করতে পারবেন।

পর্বসমূহ

পর্ব-ক: একাডেমিক পরিকল্পনার সংজ্ঞা ও এর উপাদানসমূহ

বিদ্যালয়ের শিক্ষাক্রম বাস্তবায়ন সম্পর্কিত সমগ্র কাজ কখন, কীভাবে, কাদের মাধ্যমে সুচারুরূপে সম্পাদন করা হবে এ সম্পর্কিত পূর্বে তৈরি ধারাবাহিক প্রক্রিয়ার রূপরেখাই হলো একাডেমিক পরিকল্পনা।

একাডেমিক পরিকল্পনার প্রধান উপাদান হলো : (ক) বার্ষিক কর্ম-পরিকল্পনা, (খ) পাঠ-পরিকল্পনা এবং (গ) ক্লাশ রুটিন।

পর্ব-খ : বার্ষিক পাঠ-পরিকল্পনার সংজ্ঞা ও প্রয়োজনীয়তা

বিদ্যালয়ের কার্যক্রম ও শিক্ষাদান পরিকল্পনার মূখ্য বিষয় হল এটা। পাঠ্যসূচি অনুসরণে এবং রচিত পাঠ্যপুস্তক অনুযায়ী পাঠ্য বিষয়গুলো পাঠদানের এবং মূল্যায়নের পরিকল্পনাকেই বার্ষিক পাঠ পরিকল্পনা বলা হয়ে থাকে। এতে কোন একটি শ্রেণির জন্য নির্ধারিত কোন বিষয়ের পাঠ্য পুস্তকের পঠিতব্য বিষয়গুলো পাঠদানের পরিকল্পনা এবং কোন মাসে কোন সময় পরীক্ষাগুলো অনুষ্ঠিত হবে তার পরিকল্পনা করা হয়। পরিকল্পনা অনুযায়ী পাঠদানে অগ্রসর হলে সমগ্র বৎসরে নির্ধারিত পাঠ্যসূচি সম্পূর্ণভাবে শিক্ষাদান করা সম্ভব হয়। আর তখনই আশা করা যায় যে, শিক্ষার্থী পরবর্তী শ্রেণিতে উত্তীর্ণ হওয়ার যোগ্যতা অর্জন করেছে। পাঠ্যসূচি / পাঠ্যপুস্তক পড়িয়ে শেষ না হলে শিক্ষার্থী পরবর্তী শ্রেণির পাঠ গ্রহণের যোগ্যতা অর্জনে সক্ষম হয় না। এক্ষেত্রে গুরুত্বপূর্ণ দিক হচ্ছে - যথাসময়ে শ্রেণি পাঠদান সম্পন্নকরণ, হাতে কলমে শিক্ষাদান করা এবং পরীক্ষার মাধ্যমে যাচাই করা। এ লক্ষ্যে বার্ষিক পাঠ পরিকল্পনা প্রণয়ন করা অত্যন্ত গুরুত্বপূর্ণ।

বার্ষিক পাঠ পরিকল্পনার প্রভাবে সারা দেশের মাধ্যমিক বিদ্যালয়ের একই পাঠ্যসূচি ও পাঠপুস্তক ব্যবহার হওয়া সত্ত্বেও বিভিন্ন বিদ্যালয়ের পাঠের অগ্রগতি তারতম্য পরিলক্ষিত হয়। আবার কোন কোন বিদ্যালয়ের অনেক বিষয়ের পাঠ অসমাপ্ত থেকে যায়। অপর দিকে অধিকাংশ ক্ষেত্রে এক একটি টার্মের শেষে ও বৎসরের শেষে তাড়াহুড়া করে অসমাপ্ত পাঠ শেষ করার প্রবণতা লক্ষ করা যায়। এটাও দেখা যায় যে, কোন বিদ্যালয়ের কোন কোন বিষয়ের পাঠ অনেক পূর্বে শেষ হয়ে যায় এবং পুনঃপাঠ করতে থাকে আবার কোন বিষয়ের পাঠ একবারও শেষ হয় না। পাঠ পরিকল্পনার অভাবে এটা হয়।

পাঠ-পরিকল্পনা থাকলে প্রধান শিক্ষক সে অনুযায়ী পাঠদানের অগ্রগতি এবং যথার্থতা সুষ্ঠুভাবে যাচাই ও তত্ত্বাবধান করতে পারেন। একটি বড় ব্যাপার এই যে, শ্রেণি শিক্ষক নিজেই তার পাঠদানের অগ্রগতি ও মানের ব্যাপারে সচেতন ও সতর্ক হতে পারেন, পর্যালোচনা করে ব্যবস্থা নিতে পারেন। প্রয়োজনে প্রধান শিক্ষকের পরামর্শ ও সহযোগিতা নিতে পারেন। বহিঃপরিদর্শকের পক্ষেও বিদ্যালয়ের পাঠদান ও বিভিন্ন কর্মকাণ্ডের অগ্রগতি যাচাই ও পর্যালোচনা করে প্রয়োজনীয় পরামর্শ ও দিক নির্দেশনা দেওয়া সহজ হয়। বার্ষিক পাঠ পরিকল্পনা থাকলে সকল বিদ্যালয়ের পাঠের অগ্রগতির মধ্যে একটি সামঞ্জস্যতা থাকে এবং পাঠ অসমাপ্ত থাকার প্রবণতা হ্রাস পায়।

তাহলে এবার আসুন আমরা ষষ্ঠ শ্রেণির বাংলা (চারুপাঠ) র একটি বার্ষিক পাঠ-পরিকল্পনা প্রণয়ন করি -

সাময়িক পরীক্ষা ও কার্যদিবস	বিষয়বস্তু ও পাঠ	পিরিয়ড সংখ্যা	পাঠ সমাপ্তির তারিখ	মন্তব্য
প্রথম সাময়িক পরীক্ষা				
দ্বিতীয় সাময়িক পরীক্ষা				
তৃতীয় সাময়িক পরীক্ষা				

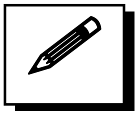

পর্ব-গ : দৈনিক পাঠ-পরিকল্পনা ও ক্লাস রুটিন

শ্রেণিকক্ষে শিক্ষার্থীদের সামনে একটি বিশেষ পাঠ উপস্থাপনের উদ্দেশ্যে সুচিন্তিত পদ্ধতিতে ধারাবাহিক প্রক্রিয়ার পরিকল্পনার রূপটি হল দৈনিক পাঠ পরিকল্পনা। দৈনিক পাঠ পরিকল্পনা প্রস্তুতের সময় যেসব বিষয় বিবেচনায় আনতে হবে তা হলো বিষয়বস্তুর লক্ষ্য, উদ্দেশ্য, প্রয়োজনীয় সহায়ক সামগ্রী, বিষয়ের রূপরেখা, পাঠদান পদ্ধতি, শিক্ষার্থীদের শিখন মূল্যায়ন এবং নির্ধারিত কাজ।

দৈনিক পাঠের সফলতা পাঠ পরিকল্পনার উপরই নির্ভর করে। পাঠ পরিকল্পনার প্রধান উদ্দেশ্য হল সফলতার সাথে শিক্ষকের শ্রেণিকক্ষে পাঠ উপস্থাপন এবং পাঠের উদ্দেশ্যের সফল বাস্তবায়ন। এই সাথে শিক্ষার্থীদের বিষয়বস্তু আয়ত্তকরণ ও পাঠ অগ্রগতি মূল্যায়ন। তাই পাঠ পরিকল্পনা করা অতীব প্রয়োজন।

সময়সূচি বা ক্লাস রুটিন

শিক্ষাদান পরিকল্পনায় শ্রেণি পাঠদান কর্মসূচি বা ক্লাস রুটিন একটি গুরুত্বপূর্ণ বিষয়। সময়সূচির মাধ্যমেই শিক্ষাক্রমকে শিক্ষার্থীদের নিকট তুলে ধারা হয়। সময়সূচি অনুযায়ী বিদ্যালয়ের পাঠদান কার্যাবলি পরিচালিত হয়। পাঠদান সময়সূচিতে বিদ্যালয়ের দর্শন প্রতিফলিত হয় এবং বিদ্যালয়ের কর্মকাণ্ডকে এটা প্রভাবান্বিত করে। শ্রেণি পাঠদান সময়সূচি সাপ্তাহিক নির্ঘণ্ট অনুযায়ী রচনা করা হয়। সুষ্ঠু ও যুক্তিসংগত সময়সূচি শিক্ষাদান কার্যক্রমকে ফলপ্রসূ করে তোলার জন্য

একটি হাতিয়ার; অন্য দিকে ত্রুটিপূর্ণ সময়সূচি শিক্ষাদান ও অগ্রগতিকে ব্যাহত করে। এ জন্য খুব সতর্কতার সঙ্গে সময়সূচি তৈরি করতে হয়। বিদ্যালয়ের শিক্ষকদের সুচিন্তিত মতামত গ্রহণ করে সময়সূচি তৈরি করা উচিত। সময়সূচি তৈরি করার সময় নিম্নবর্ণিত বিষয়গুলোর প্রতি লক্ষ রেখে ও বিবেচনা করে কাজ করতে হয়।

- যে শিক্ষক যে বিষয়ে অভিজ্ঞ তাঁকে সে বিষয় পাঠদানের দায়িত্ব দিতে হবে।
- শিক্ষকদের কর্মভার অর্পণে নিরপেক্ষতা রক্ষা করতে হবে।
- শিক্ষকের দক্ষতা, জ্ঞান, বয়স ও জেন্ডারভিত্তিক সমতা রক্ষা করতে হবে।
- সময়সূচি শিক্ষার্থী কেন্দ্রিক হওয়া উচিত। বিভিন্নমুখী কাজে শিক্ষার্থীদের পরিপূর্ণ আগ্রহ ও মনোযোগ ধরে রাখার মত বিষয়সমূহ এবং তাদের বয়স খেয়াল, রুচি, নিবিড়তর পরিসর, ক্ষমতার পরিধি, দল গঠন, ক্লাসের আকার ও তাদের ভবিষ্যত গঠন প্রত্যাশাকেও বিবেচনায় আনা প্রয়োজন।
- গুরুত্ব অনুসারে পাঠ্যসূচির সকল বিষয় অন্তর্ভূক্তি।
- বিষয়বস্তুর গুরুত্ব এবং পাঠ্যসূচির সকল বিষয় (বিষয়ের পাঠ পরিকল্পনার ইউনিট সংখ্যা) মোতাবেক ক্লাসের সংখ্যা বণ্টন।
- বিদ্যালয়ের শ্রেণি কক্ষসমূহের যথাযথ ব্যবহার
- বিজ্ঞান বিষয়ে ক্লাসসূমহ বিজ্ঞানাগারে নেওয়া ও হাতে কলমে ক্লাশগুলো পরিচালনার ব্যবস্থা।
- বিদ্যালয়ের অন্যান্য কক্ষ যেমন, ওয়ার্কসপ, ব্যায়ামাগার, মিলনায়তন, খেলার মাঠ, গ্রন্থাগার ইত্যাদির ব্যবহারও প্রয়োজন।
- পিরিয়ডের ব্যপ্তি : কোন বিষয়ের কোন ক্লাস কতটুকু সময় ধরে চলবে (৪০/৩০ মিনিট ইত্যাদি) এবং দুই পিরিয়ডের মাঝে কিছু সময় প্রদান (বই ও শিখন দ্রব্যাদি ও শিক্ষক পরিবর্তনের জন্য)
- সময়সূচিতে দৈনিক সমাবেশ, আহার / নাস্তা, খেলাধুলা ইত্যাদি সবকিছুই উল্লেখ থাকা।

বর্তমানে পঠনীয় বিষয়বস্তুও সংখ্যা বেশি, সময়সূচিতে তার সামঞ্জস্য বিধান করতে কঠোর অনুশীলন করতে হয়। আবার বিভিন্ন বিষয়ের বিধিনিষেধ মানতে কাজটি আরো কঠিন হয়ে দাঁড়ায়। বিদ্যালয়ে ধারণ ক্ষমতার বাইরে শিক্ষার্থী হলে সময়সূচি প্রণয়ন ও বাস্তবায়ন কঠিন হয়ে উঠে। তাই একটি সুষ্ঠু কার্যকর ও নির্দেশনামূলক সময়সূচি তৈরি যথেষ্ট দক্ষতার ব্যাপার।

প্রিয় শিক্ষার্থীবৃন্দ তাহলে এবার আসুন আমরা ক্লাস রুটিন তৈরির বিবেচ্য দিকসমূহ নিচের চিত্রে লিখি -

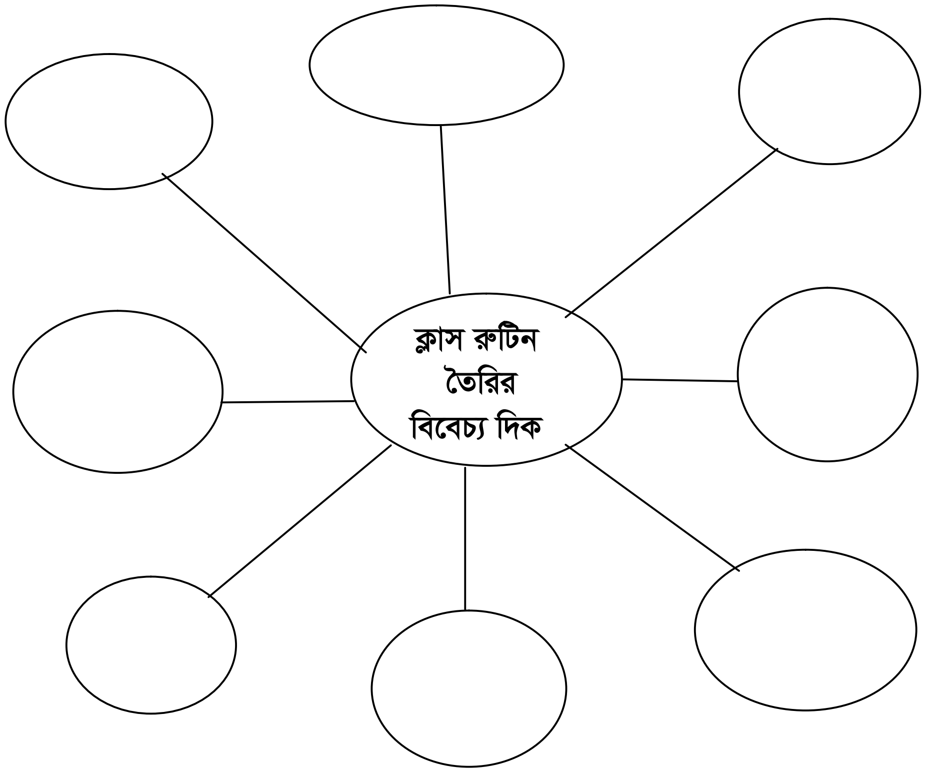

ইউনিট-১০ **অধিবেশন-১**

মূল শিখনীয় বিষয়

একাডেমিক পরিকল্পনা, শিক্ষাদান পরিকল্পনা ও সময়সূচি

পরিকল্পনা

শিশুর দেহ, মন, আত্মা এবং তার অন্তর্নিহিত শক্তি ও সম্ভাবনাগুলোর বিকাশ ঘটিয়ে তাকে জীবনে সুপ্রতিষ্ঠিত হওয়ার লক্ষ্যে তার রুচি ও আগ্রহ অনুযায়ী দক্ষ ব্যক্তি হিসেবে গড়ে তুলে দেশ ও জাতির জন্য সম্পদে পরিণত করাই শিক্ষার লক্ষ্য। মাধ্যমিক বিদ্যালয়ের সমগ্র কর্মকান্ড-কে সাধারণত তিন ভাগে ভাগ করা যায়। (১) প্রশাসনিক, (২) একাডেমিক ও (৩) উন্নয়ন। এই তিনটি বিভাগের সুষ্ঠু পরিকল্পনার উপর নির্ভর করে মাধ্যমিক বিদ্যালয়ের অগ্রগতি। বিদ্যালয়ের শিক্ষাক্রমিক ও সহশিক্ষাক্রমিক এবং তৎসংশ্লিষ্ট কার্যাবলি একাডেমিক কর্মকান্ড হিসেবে চিহ্নিত। মাধ্যমিক বিদ্যালয়ের একাডেমিক ব্যবস্থাপনায় সামগ্রিক কার্যকলাপ নির্ধারিত সময়ের মধ্যে সুষ্ঠু ও উদ্দেশ্যানুগভাবে সম্পন্ন করার জন্যে যে সব সিদ্ধান্ত গ্রহণ করা হয় তাকে একাডেমিক পরিকল্পনা বলা হয়। অর্থাৎ বিদ্যালয়ে শিক্ষাক্রম বাস্তবায়ন সম্পর্কিত সমগ্র কাজ কখন, কীভাবে, কাদের মাধ্যমে সুচারুরূপে সম্পাদন করা হবে এ সম্পর্কিত পূর্বে তৈরি ধারাবাহিক প্রক্রিয়ার রূপরেখাই হলো একাডেমিক পরিকল্পনা। বিদ্যালয়ের একাডেমিক পরিকল্পনার প্রধান উপাদান তিনটি - (১) বার্ষিক কর্ম-পরিকল্পনা, (২) পাঠ-পরিকল্পনা ও (৩) ক্লাস রুটিন।

প্রধান শিক্ষক একাডেমিক পরিকল্পনার সকল বিষয় সুষ্ঠু বাস্তবায়নের মাধ্যমে অভীষ্ট লক্ষ্যে পৌঁছানোর জন্য শিক্ষাবর্ষ শুরু হবার আগেই নিম্নবর্ণিত কমিটিগুলো গঠনপূর্বক কমিটির উদ্দেশ্য ও দায়িত্ব সংশ্লিষ্ট সকলকে বুঝিয়ে দেবেন।

কমিটিসমূহ

১. একাডেমিক কাউন্সিল
২. বার্ষিক কর্ম পরিকল্পনা প্রণয়ন কমিটি
৩. ভর্তি কমিটি
৪. রুটিন প্রণয়ন কমিটি
৫. পরীক্ষা কমিটি
৬. আইন শৃঙ্খলা কমিটি
৭. সাংস্কৃতিক কমিটি
৮. ক্রীড়া কমিটি
৯. ধর্মীয় দিবস পালন কমিটি
১০. বিভিন্ন জাতীয় দিবস পালন কমিটি
১১. অর্থ কমিটি

১২. ক্রয় কমিটি
১৩. টেন্ডার লীজ ও বিক্রয় কমিটি
১৪. হোস্টেল কমিটি (ক্ষেত্র বিশেষ)
১৫. সাহিত্য ও ম্যাগাজিন কমিটি
১৬. উন্নয়ন ও পরিকল্পনা কমিটি
১৭. পরিষ্কার পরিচ্ছন্নতা কমিটি
১৮. গ্রন্থাগার কমিটি
১৯. বনভোজন কমিটি
২০. অভ্যন্তরীণ ফলাফল লিখন ও ফলাফল সংরক্ষণ কমিটি

প্রধান শিক্ষক কমিটিগুলোর কার্যকলাপ তদারকি ও নিয়ন্ত্রণ করবেন এবং বিভিন্ন কমিটির কাজের মধ্যে সমন্বয় সাধনপূর্বক প্রত্যেক কমিটিকে প্রয়োজনীয় উপদেশ ও সহায়তা প্রদান করবেন। শিক্ষার লক্ষ্য অর্জনের জন্য যে সার্বিক পরিকল্পনা তাই হল শিক্ষাদান পরিকল্পনা। এ পরিকল্পনা করতে হলে বহুবিধ বিষয়কে বিবেচনায় রাখতে হয়। যেমন -

- শিশুর পারিপার্শ্বিক অবস্থা বা পরিবেশ,
- তার শারীরিক ও মানসিক বিকাশের ধারা,
- তার আগ্রহ, রুচি, খেয়াল, বুদ্ধি ইত্যাদি,
- বয়স স্তর অনুযায়ী তার আচরণিক বৈশিষ্ট্য,
- তার চাহিদাসমূহ,
- তার গ্রহণযোগ্যতা,
- শিক্ষার লক্ষ্য ও উদ্দেশ্য,
- জাতীয় চাহিদা,
- শিক্ষা প্রতিষ্ঠান ও তার সুযোগ সুবিধা,
- শিক্ষক,
- শিখন সামগ্রি,
- শিক্ষাদান পদ্ধতি এবং
- মূল্যায়ন।

শিক্ষাদান পরিকল্পনার ভিত্তিমূল হচ্ছে শিক্ষাক্রম। শিক্ষাক্রমই হচ্ছে শিক্ষাদানের মূল পরিকল্পনা। দেশ ও জাতির চাহিদা অনুযায়ী প্রাথমিক স্তর থেকে উচ্চ শিক্ষার স্তর পর্যন্ত কোন গ্রেডে কী কী বিষয় শিক্ষাদান করতে হবে, কত প্রকার ও কী ধরনের শিক্ষার ধারা থাকবে, একটি ধারার সঙ্গে

অন্য ধারার কোন কোন দিকে কতটুকু মিল থাকবে, শিক্ষা ব্যবস্থা কীরূপ হবে, শিক্ষাদান পদ্ধতি ও মূল্যায়ন কৌশল কিরূপ হবে ইত্যাদির পরিকল্পনা ও রূপরেখা হচ্ছে শিক্ষাক্রম।

শিক্ষাক্রম অনুসরণে পাঠ্যসূচি প্রণীত হয়। পাঠ্যসূচি অনুযায়ী শিখন সামগ্রি (বই-পুস্তক ও সহায়ক সামগ্রি উপকরণ) রচিত হয়। এ পাঠ্যসূচি ও শিখন সামগ্রি হাতে নিয়ে শিক্ষা প্রতিষ্ঠানসমূহ শিক্ষাদান কার্য পরিচালনা করে এবং শিক্ষার্থীদের অগ্রগতির মূল্যায়ন করে থাকে। এ যাবতীয় কার্যক্রম শিক্ষাদান পরিকল্পনার অন্তর্ভুক্ত।

শিক্ষাক্রম প্রণয়নে, শিক্ষাক্রম বিস্তরণ, পাঠ্যসূচি প্রণয়ন, পাঠ্যপুস্তক রচনা, পাঠদান পদ্ধতির উন্নয়ন এবং যাবতীয় কার্যক্রমের জন্য শিক্ষা ব্যবস্থার পরিকল্পনা করতে হয়। বাস্তবায়নের জন্য শিক্ষা ব্যবস্থার পরিকল্পনা, তত্ত্বাবধান, পরিবীক্ষণ, শিক্ষা প্রতিষ্ঠান সৃষ্টি ও উন্নয়ন, শিক্ষকদের পেশাগত উন্নয়নের জন্য এবং শিক্ষা প্রতিষ্ঠানে শিক্ষাদান কর্মসূচির পরিকল্পনা করতে হয়। এখানে বর্ণিত এ সমস্ত পরিকল্পনার সমন্বয়ই হল একটি দেশের “শিক্ষাদান পরিকল্পনা”। শিক্ষাক্রম রচনা থেকে শুরু করে শিক্ষা প্রতিষ্ঠানে শিক্ষাদান পরিকল্পনা কর্মসূচিতে যেয়ে এটা শেষ হয়।
শিক্ষাক্রম প্রণয়ন ও বাস্তবায়ন এবং এর সংশ্লিষ্ট বিষয়াবলি সম্বন্ধে মড্যুল - ৩ এবং অন্যান্য অধ্যায়ে উল্লেখ আছে। এ অধিবেশনে শিক্ষা প্রতিষ্ঠানে শিক্ষাদান পরিকল্পনা বা বিদ্যালয় ব্যবস্থাপনা ও শিক্ষকের কর্মসূচির অন্তর্গত করণীয় বিষয়াবলিই উল্লেখ্য।

বার্ষিক পরিকল্পনা

শিক্ষাদানের বার্ষিক পরিকল্পনা : একটি শিক্ষা প্রতিষ্ঠান সমগ্র বৎসর শিক্ষাদানের জন্য যে পরিকল্পনা গ্রহণ করে তাই হচ্ছে ঐ শিক্ষা প্রতিষ্ঠানের বার্ষিক শিক্ষাদান পরিকল্পনা। এ পরিকল্পনার মধ্যে থাকে -

(ক) বার্ষিক পাঠ পরিকল্পনা
(খ) সহশিক্ষাক্রমিক কার্যাবলির পরিকল্পনা
(গ) সময়সূচি বা ক্লাস রুটিন
(ঙ) শিক্ষাদান পদ্ধতি এবং
(চ) মূল্যায়ন পরিকল্পনা।

ক) বার্ষিক পাঠ পরিকল্পনা :

বিদ্যালয়ের কার্যক্রম ও শিক্ষাদান পরিকল্পনার মুখ্য বিষয় হল এটা। পাঠ্যসূচি অনুসরণে এবং রচিত পাঠ্যপুস্তক অনুযায়ী পাঠ্য বিষয়গুলো বছরব্যাপী পাঠদানের এবং মূল্যায়নের পরিকল্পনাকেই বার্ষিক পাঠ পরিকল্পনা বলা হয়ে থাকে। কোন একটি শ্রেণির জন্য নির্ধারিত কোন

বিষয়ের পাঠ্য পুস্তকের পঠিতব্য বিষয়গুলো পাঠদানের পরিকল্পনা এবং কোন মাসে কোন সময় পরীক্ষাগুলো অনুষ্ঠিত হবে তার পরিকল্পনা। পরিকল্পনা অনুযায়ী পাঠদানে অগ্রসর হলে সমগ্র বৎসরে নির্ধারিত পাঠ্যসূচি সম্পূর্ণভাবে শিক্ষাদান করা সম্ভব হয়। আর তখনই আশা করা যায় যে, শিক্ষার্থী পরবর্তী শ্রেণিতে উত্তীর্ণ হওয়ার যোগ্যতা অর্জন করেছে। পাঠ্যসূচি / পাঠ্যপুস্তক পড়িয়ে শেষ না হলে শিক্ষার্থী পরবর্তী শ্রেণির পাঠ গ্রহণের যোগ্যতা অর্জনে সক্ষম হয় না। এক্ষেত্রে গুরুত্বপূর্ণ দিক হচ্ছে - যথাসময়ে শ্রেণি পাঠদান সম্পন্নকরণ, হাতে কলমে শিক্ষাদান করা এবং পরীক্ষার মাধ্যমে যাচাই করা। এ লক্ষ্যে বার্ষিক পাঠ পরিকল্পনা প্রণয়ন করা অত্যন্ত গুরুত্বপূর্ণ।

বার্ষিক পাঠ পরিকল্পনার প্রয়োজনীয়তা :

প্রয়োজনীয়তা

বার্ষিক পাঠ পরিকল্পনার কারণে সারা দেশের মাধ্যমিক বিদ্যালয়ের একই পাঠ্যসূচি ও পাঠ্যপুস্তক ব্যবহার হওয়া সত্ত্বেও বিভিন্ন বিদ্যালয়ের পাঠের অগ্রগতি তারতম্য পরিলক্ষিত হয়। আবার কোন কোন বিদ্যালয়ের অনেক বিষয়ের পাঠ অসমাপ্ত থেকে যায়। অপর দিকে অধিকাংশ ক্ষেত্রে এক একটি টার্মের শেষে ও বৎসরের শেষে তাড়াহুড়া করে অসমাপ্ত পাঠ শেষ করার প্রবণতা লক্ষ করা যায়। এটাও দেখা যায় যে, কোন বিদ্যালয়ের কোন কোন বিষয়ের পাঠ অনেক পূর্বে শেষ হয়ে যায় এবং পুনঃপাঠ করতে থাকে আবার কোন বিষয়ের পাঠ একবারও শেষ হয় না। পাঠ পরিকল্পনার অভাবে এটা হয়।

পাঠ পরিকল্পনা থাকলে প্রধান শিক্ষক সে অনুযায়ী পাঠদানের অগ্রগতি এবং যথার্থতা সুষ্ঠুভাবে যাচাই ও তত্ত্বাবধান করতে পারেন। একটি বড় ব্যাপার এই যে, শ্রেণি শিক্ষক নিজেই তার পাঠদানের অগ্রগতি ও মানের ব্যাপারে সচেতন ও সতর্ক হতে পারেন, পর্যালোচনা করে ব্যবস্থা নিতে পারেন। প্রয়োজনে প্রধান শিক্ষকের পরামর্শ ও সহযোগিতা নিতে পারেন। বহিঃপরিদর্শকের পক্ষেও বিদ্যালয়ের পাঠদান ও বিভিন্ন কর্মকাণ্ডের অগ্রগতি যাচাই ও পর্যালোচনা করে প্রয়োজনীয় পরামর্শ ও দিক নির্দেশনা দেওয়া সহজ হয়।

বার্ষিক পাঠ পরিকল্পনা থাকলে সকল বিদ্যালয়ের পাঠের অগ্রগতির মধ্যে একটি সামঞ্জস্যতা থাকে এবং পাঠ অসমাপ্ত থাকার প্রবণতা হ্রাস পায়।

বার্ষিক পাঠ পরিকল্পনা প্রণয়ন করার পদ্ধতি

একটি শিক্ষা প্রতিষ্ঠানের বার্ষিক পাঠ পরিকল্পনা করতে হলে নিম্নবর্ণিত কাজগুলো করতে হবে :

(ক) কার্য দিবস হিসাবকরণ ঃ ছুটির দিনগুলো হিসাব করে বাদ দেওয়া।

(খ) পরীক্ষা ও সহপাঠ্যক্রমিক কার্যাবলির দিনগুলো হিসাব করা (যে দিনগুলোতে শ্রেণি পাঠদান করা হয় না)।

(গ) সহপাঠ্যক্রমিক কার্যাবলির দিনগুলো নির্ধারণ ।

(ঘ) অতঃপর প্রতি টার্মে পাঠদান করার জন্য প্রাপ্ত দিনগুলো অনুযায়ী পাঠ্যসূচি বিভাজন করে নৈন্দিন পাঠ ইউনিট ঠিক করে নেওয়া।

যেমন:	বাৎসরিক ছুটি -	৮৫ দিন।
	সাপ্তাহিক ছুটি -	৫২ দিন।
	মোট -	**১৩৭ দিন।**

অতএব ৩৬৫ - ১৩৭ = ২২৮ দিন। বৎসরে মোট কর্মদিবস থাকে ২২৮দিন। এর মধ্য হতে নিম্নবর্ণিত দিবসগুলোতে শ্রেণি পাঠদান করা হয় না। যেমন ঃ

৩টি পরীক্ষা - ১২×৩ =	৩৬ দিন।
বার্ষিক ক্রীড়া প্রতিযোগিতাকে কেন্দ্র করে -	৩ দিন।
শিক্ষা সফর -	২ দিন।
সাহিত্য বিষয়ক প্রতিযোগিতা -	১ দিন।
সাংস্কৃতিক বিষয়ক প্রতিযোগিতা -	১ দিন।
বিতর্ক প্রতিযোগিতা -	১ দিন।
শিক্ষক অভিভাবক দিবস -	১ দিন।
বার্ষিক মিলাদ -	১ দিন।
বার্ষিক পরীক্ষার শেষে ফল প্রকাশের জন্য -	৩ দিন।
অন্যান্য -	৩ দিন।
মোট	**৫২ দিন।**

অতএব ২২৮ - ৫২ = ১৭৬ দিন প্রকৃত পক্ষে শ্রেণি পাঠদানের সময় পাওয়া যায় সারা বৎসরে। শ্রেণি পাঠদান না হওয়ার এ দিনগুলো এবং ছুটির দিনগুলো বাৎসরিক ক্যালেন্ডারে বসিয়ে কোন মাসে কতদিন ক্লাস নেওয়ার সুযোগ পাওয়া যায় তা হিসাব করে প্রতি বিষয় শিক্ষক তার উপর অর্পিত শ্রেণিসমূহে তার বিষয়ের পাঠ্যসূচিকে প্রাপ্ত দিনগুলোতে বিভক্ত করে এক এক ইউনিট হিসেবে গণ্য করে নৈন্দিন পাঠদান ইউনিট ঠিক করে পাঠদানে অগ্রসর হলে আশা করা যায় সময়মত পাঠ্যসূচি সমাপ্ত করতে পারবেন। শ্রেণির বিষয় শিক্ষক তার দায়িত্বের প্রতি সচেতন হবেন।

যেমন: প্রথম সাময়িক পরীক্ষা যদি এপ্রিল মাসের ১০ তারিখ থেকে শুরু হয় এবং ২২ তারিখে শেষ হয়। তবে ১লা জানুয়ারি থেকে ৯ এপ্রিল পর্যন্ত ৯৯ দিনের মধ্যে ছুটি, সাপ্তাহিক ছুটি এবং এ সময়ের মধ্যে সহপাঠ্যক্রমিক কার্যাবলি অনুষ্ঠিত হওয়ার দিনগুলো বাদ দিলে হয়ত ৬৮ থেকে

৭২ দিন শ্রেণি পাঠদানের সুযোগ পাওয়া যাবে। যদি ৭০ দিন হাতে পাওয়া যায় তবে প্রথম সাময়িক পরীক্ষা পর্যন্ত পাঠ্যসূচির নির্ধারিত বিষয়বস্তু ক্লাস রুটিন অনুযায়ী প্রাপ্ত সংখ্যক ক্লাস অনুযায়ী বিভক্ত করে এক এক ইউনিট হিসেবে গণ্য করে তদনুযায়ী পাঠদানে অগ্রসর হতে হবে। এভাবে দ্বিতীয় সাময়িক পরীক্ষা শেষ হওয়ার তারিখ থেকে বার্ষিক পরীক্ষার পূর্ব পর্যন্ত প্রাপ্ত দিনগুলো হিসাব করে বার্ষিক পাঠদান পরিকল্পনা নির্ধারণ করে নিতে হবে।

(খ) সহ পাঠ্যক্রমিক কার্যাবলির পরিকল্পনা

শিক্ষার্থীর শারীরিক, মানসিক, আবেগিক ও সৃজনশীল বিকাশের জন্য শিক্ষাক্রমিক শিখনের পাশাপাশি সহশিক্ষাক্রমিক কার্যাবলির গুরুত্ব অপরিসীম। এতে তাদের সামাজিক মনোবৃত্তি, পারস্পরিক সহযোগিতা ও সহমর্মিতার মনোভাবও সৃষ্টি হয়। অতএব বৎসরের শুরুতেই বিদ্যালয়ে সারা বৎসরে কী কী কার্যাবলি পরিচালনা করতে হবে তা নির্ধারণ করে নিতে হবে। সঙ্গে সঙ্গে কোন বিষয়টি কখন অনুষ্ঠিত হবে তা ঠিক করে প্রত্যেক কাজের জন্য নির্বাহী কমিটি ঠিক করে দায়িত্ব বণ্টন এবং সম্ভাব্য বাজেট প্রণয়ন করতে হবে। সহশিক্ষাক্রমিক কার্যাবলির পরিকল্পনা প্রণয়ন করার সময় নিম্নের বিষয় বিবেচনায় রাখতে হবে :

- শিক্ষার্থীদের চাহিদা।
- বয়স অনুযায়ী তাদের জন্য বিষয়বস্তুর প্রতিযোগিতার ব্যবস্থা।
- সকলকে / অধিকসংখ্যক শিক্ষার্থীর অংশগ্রহণের সুযোগ সৃষ্টি।
- বিভিন্ন খেলাধুলার ব্যাপারে প্রাকৃতিক অবস্থা বা ঋতুকাল।
- বিদ্যালয়ের সুযোগ সুবিধা ও আর্থিক দিক।
- এলাকার জনগণের সম্পৃক্ততা।
- প্রতিবন্ধীদের অংশগ্রহণের সুযোগ সৃষ্টি।
- জেন্ডার সমতা রক্ষা।
- দক্ষতা বিবেচনায় শিক্ষকদের দায়িত্ব বণ্টন এবং দক্ষতা সৃষ্টির সুযোগ রাখা।

দৈনিক পাঠ পরিকল্পনা

শ্রেণিকক্ষে শিক্ষার্থীদের সামনে একটি বিশেষ পাঠ উপস্থাপনের উদ্দেশ্যে সুচিন্তিত পদ্ধতিতে ধারাবাহিক প্রক্রিয়ার পরিকল্পনার রূপটি হল দৈনিক পাঠ পরিকল্পনা। দৈনিক পাঠ পরিকল্পনা প্রস্তুতের সময় যেসব বিষয় বিবেচনায় আনতে হবে তা হলো বিষয়বস্তুর লক্ষ্য, উদ্দেশ্য, প্রয়োজনীয় সহায়ক সামগ্রি, বিষয়ের রূপরেখা, পাঠদান পদ্ধতি, শিক্ষার্থীদের শিখন মূল্যায়ন এবং নির্ধারিত কাজ।

দৈনিক পাঠের সফলতা পাঠ পরিকল্পনার উপরই নির্ভর করে। পাঠ পরিকল্পনার প্রধান উদ্দেশ্য হল সফলতার সাথে শিক্ষকের শ্রেণিকক্ষে পাঠ উপস্থাপন এবং পাঠের উদ্দেশ্যের সফল বাস্তবায়ন। এই সাথে শিক্ষার্থীদের বিষয়বস্তু আয়ত্তকরণ ও মূল্যায়ন। তাই পাঠ পরিকল্পনা করা অতীব প্রয়োজন।

(গ) সময়সূচি বা ক্লাস রুটিন

ক্লাস রুটিন

শিক্ষাদান পরিকল্পনায় শ্রেণি পাঠদান কর্মসূচি বা ক্লাস রুটিন একটি গুরুত্বপূর্ণ বিষয়। সময়সূচির মাধ্যমেই শিক্ষাক্রমকে শিক্ষার্থীদের নিকট তুলে ধারা হয়। সময়সূচি অনুযায়ী বিদ্যালয়ের পাঠদান কার্যাবলি পরিচালিত হয়। পাঠদান সময়সূচিতে বিদ্যালয়ের দর্শন প্রতিফলিত হয় এবং বিদ্যালয়ের কর্মকাণ্ডকে এটা প্রভাবান্বিত করে। শ্রেণি পাঠদান সময়সূচি সাপ্তাহিক নির্ঘন্ট অনুযায়ী রচনা করা হয়। সুষ্ঠু ও যুক্তিসংগত সময়সূচি শিক্ষাদান কার্যক্রমকে ফলপ্রসূ করে তোলার জন্য একটি হাতিয়ার; অন্য দিকে ত্রুটিপূর্ণ সময়সূচি শিক্ষাদান ও অগ্রগতিকে ব্যাহত করে। এ জন্য খুব সতর্কতার সঙ্গে সময়সূচি তৈরি করতে হয়। বিদ্যালয়ের শিক্ষক৪দের সুচিন্তিত মতামত গ্রহণ করে সময়সূচি তৈরি করা উচিত। সময়সূচি তৈরি করার সময় নিম্নবর্ণিত বিষয়গুলোর প্রতি লক্ষ রেখে ও বিবেচনা করে কাজ করতে হয়।

- যে শিক্ষক যে বিষয়ে অভিজ্ঞ তাঁকে সে বিষয় পাঠদানের দায়িত্ব দিতে হবে।
- শিক্ষকদের কর্মভার অর্পণে নিরপেক্ষতা রক্ষা করতে হবে।
- শিক্ষকের দক্ষতা, জ্ঞান, বয়স ও জেন্ডারভিত্তিক সমতা রক্ষা করতে হবে।
- সময়সূচি শিক্ষার্থী কেন্দ্রীক হওয়া উচিত। বিভিন্নমুখী কাজে শিক্ষার্থীদের পরিপূর্ণ আগ্রহ ও মনোযোগ ধরে রাখার মত বিষয়সমূহ এবং তাদের বয়স খেয়াল রুচি, নিবিড়তর পরিসর, ক্ষমতার পরিধি, দল গঠন, ক্লাসের আকার ও তাদের ভবিষ্যত গঠন প্রত্যাশাকেও বিবেচনায় আনা প্রয়োজন।
- গুরুত্ব অনুসারে পাঠ্যসূচির সকল বিষয় অন্তর্ভুক্তি।
- বিষয়বস্তুর গুরুত্ব এবং পাঠ্যসূচির সকল বিষয় (বিষয়ের পাঠ পরিকল্পনার ইউনিট সংখ্যা) মোতাবেক ক্লাসের সংখ্যা বণ্টন।
- বিদ্যালয়ের শ্রেণি কক্ষসমূহের যথাযথ ব্যবহার
- বিজ্ঞান বিষয়ে ক্লাসসমূহ বিজ্ঞানাগারে নেওয়া ও হাতে কলমে ক্লাসগুলো পরিচালনার ব্যবস্থা।
- বিদ্যালয়ের অন্যান্য কক্ষ যেমন: ওয়ার্কসপ, ব্যায়ামাগার, মিলনায়তন, খেলার মাঠ, গ্রন্থাগার ইত্যাদির ব্যবহারও প্রয়োজন।
- পিরিয়ডের ব্যপ্তি : কোন বিষয়ের কোন ক্লাস কতটুকু সময় ধরে চলবে (৪০/৩০ মিনিট ইত্যাদি) এবং দুই পিরিয়ড়ের মধ্যবর্তীতে কিছু সময় প্রদান (বই ও শিখন দ্রব্যাদি ও শিক্ষক পরিবর্তনের জন্য)

- সময়সূচিতে দৈনিক সমাবেশ, আহার / নাস্তা , খেলাধুলা ইত্যাদি সবকিছুই উল্লেখ থাকা।

বর্তমানে পঠনীয় বিষয়বস্তুও সংখ্যা বেশি, সময়সূচিতে তার সামঞ্জস্য বিধান করতে কঠোর অনুশীলন করতে হয়। আবার বিভিন্ন বিষয়ের বিধিনিষেধ মানতে কাজটি আরো কঠিন হয়ে দাঁড়ায়। বিদ্যালয়ে ধারণ ক্ষমতার বাইরে শিক্ষার্থী হলে সময়সূচি প্রণয়ন ও বাস্তবায়ন কঠিন হয়ে উঠে। তাই একটি সুষ্ঠু, কার্যকর ও নির্দেশনামূলক সময়সূচি তৈরি যথেষ্ট দক্ষতার ব্যাপার।

দৈনিক রুটিনের নমুনা

শিক্ষক	দিন	শনিবার				রবিবার				সোমবার				মঙ্গলবার				বুধবার				বৃহস্পতিবার			
	ঘণ্টা																								

(ঘ) শিক্ষাদান পদ্ধতি

শিক্ষাদানের ক্ষেত্রে শিক্ষাদান পদ্ধতি অবলম্বন একটি অত্যন্ত গুরুত্বপূর্ণ ব্যাপার। কোন বিষয়ের পাঠদানের ক্ষেত্রে কোন ধরনের শিক্ষাদান পদ্ধতি অবলম্বন করা হবে তা বাস্তবায়নের পরিকল্পনা শিক্ষাদান পরিকল্পনার অপর প্রধান অংশ। এ ক্ষেত্রে বিবেচ্য দিকগুলো হচ্ছে ঐ পদ্ধতি অবলম্বনের জন্য শ্রেণি ব্যবস্থাপনার সুযোগ, সময়, শিক্ষোপকরণ সংগ্রহ ও ব্যবহার, শিক্ষকের প্রস্তুতি এবং শিক্ষার্থীর অংশগ্রহণ।

বর্তমানে শিক্ষার্থীর সক্রিয় অংশগ্রহণমূলক পদ্ধতি সারা বিশ্বে প্রবর্তিত হয়েছে। আমাদের দেশেও এ পদ্ধতি বাস্তবায়নের জন্য প্রক্রিয়া শুরু হয়েছে। অতএব শিক্ষার্থীর সক্রিয় অংশগ্রহণমূলক পদ্ধতি যাতে বাস্তবায়ন করা যায় সে দিকে নজর রাখতে হবে এবং শিক্ষাদান পরিকল্পনা ও সময়সূচিতে তার প্রতিফলন ঘটাতে হবে।

(ঙ) মূল্যায়ন পদ্ধতি

আমাদের দেশে সাধারণত বৎসরে তিনটি পরীক্ষার মাধ্যমে শিক্ষার্থীদের শিখন অগ্রগতি মূল্যায়ন করা হত। বর্তমানে বিদ্যালয়ভিত্তিক মূল্যায়ন ব্যবস্থা চালুর উদ্যোগ নেওয়া হয়েছে। অতএব শুধু

তিনটি টার্মিনাল পরীক্ষা নয়, বিদ্যালয় তার সুবিধামত পাক্ষিক, সাপ্তাহিক, শ্রেণিভিত্তিক পরীক্ষা নিয়ে শিক্ষক শিক্ষার্থীদের মূল্যায়ন করতে পারে। সঙ্গে সঙ্গে শ্রেণিতে তার সাড়া, উপস্থিতি, আগ্রহ, শিক্ষকের প্রদত্ত নির্ধারিত কাজ সম্পন্ন করা, তার সততা, আচরণ, একক ও দলভিত্তিক ক্লাসে তার অংশগ্রহণ, ব্যবহারিক কাজ ও ক্লাসে অংশগ্রহণ, নিয়মানুবর্তিতা, সহপাঠ্যক্রমিক কার্যাবলিতে তার উদ্যম, আগ্রহ, কৃতিত্ব ইত্যাদি বিষয়ও মূল্যায়ন করতে হবে। সময়সূচি ও শিক্ষকের কর্মকাণ্ডে এ সব বিষয়ে কাজের সুযোগ ও নির্দেশনা থাকতে হবে। মূল্যায়নের জন্য সুষ্ঠু পরিকল্পনা শিক্ষা পরিকল্পনার একটি অংশ। মূল্যায়ন করার প্রক্রিয়াগুলো অবলম্বন করতে হবে। এসব সম্বন্ধে EDBN-2315, EDBN-2316 এ বিস্তারিত আলোচনা রয়েছে।

মূল্যায়ন

১. একাডেমিক পরিকল্পনা কী? এর উপাদানসমূহ বর্ণনা করুন।

২. বার্ষিক পাঠ-পরিকল্পনার প্রয়োজনীয়তা ব্যাখ্যা করুন।

৩. বার্ষিক পাঠ-পরিকল্পনা প্রণয়নে বিবেচ্য দিকসমূহ সম্পর্কে লিখুন।

৪. মাধ্যমিক বিদ্যালয়ের ক্লাস রুটিন তৈরির নীতিসমূহ বর্ণনা করুন।

সম্ভাব্য উত্তর

পর্ব-খ

বার্ষিক পাঠ পরিকল্পনা - ২০০৭ (নমুনা)

ষষ্ঠ শ্রেণি

বিষয় : বাংলা (চারুপাঠ)

শিক্ষক --

সাময়িক পরীক্ষা ও কার্য দিবস	বিষয় বস্তু / পাঠ	পিরিয়ড সংখ্যা	পাঠ সমাপ্তির তারিখ	মন্তব্য
প্রথম সাময়িক পরীক্ষা ১.১.২০০৭ থেকে ৩০.০৪.২০০৭পর্যন্ত জানুয়ারি ---১৭ দিন ফেব্রুয়ারি - ২৪ দিন মার্চ ------ ২৩ দিন এপ্রিল ---- ২৩ দিন **মোট ----- ৮৭ দিন**	শিক্ষা সপ্তাহ, বনভোজন, বার্ষিক ক্রীড়া ও অন্যান্য অনুষ্ঠানাদির জন্য **পদ্য** ▪ আমাদের প্রিয় বাংলাদেশ ▪ সততার পুরস্কার ▪ রক্তে লেখা মুক্তিযুদ্ধ	১২ ৫ ৩ ৫		

	▪ নতুন দা ▪ মাদার তেরেসা ▪ সাগর জলের নানা প্রাণী ▪ নীল নদ আর পিরামিডের দেশ **কবিতা** ▪ জন্মেছি এই দেশে ▪ পরিচয় ▪ ওদের জন্য মমতা ▪ বাংলা ভাষা ▪ সুখ ▪ পর্যালোচনা ▪ পরীক্ষা **মোট -**	৬ ৫ ৭ ৭ ৩ ৩ ৩ ৩ ৩ ১০ ১২ **৮৭ দিন**		
দ্বিতীয় সাময়িক পরীক্ষা ১.৫.২০০৭ থেকে ১৪.০৮.২০০৭ পর্যন্ত মে --------১৮দিন জুন -------০৭ দিন জুলাই -----২৭ দিন আগস্ট ---- ১২ দিন **মোট ------ ৬৫ দিন**	**গদ্য** ▪ এক সূত্রে ▪ জানা অজানার সুন্দরবন ▪ মহাকবি আলাওল ▪ পাখিদের নিয়ে **কবিতা** ▪ সকাল ▪ প্রিয় স্বাধীনতা ▪ ঠিকানা ▪ মৈত্রী ▪ পর্যালোচনা ▪ পরীক্ষা মোট	১০ ৫ ১০ ৬ ৩ ৪ ৩ ৩ ৮ ১২ **৬৪ দিন।**		
তৃতীয় সাময়িক (বার্ষিক) পরীক্ষা ১৫.৮.২০০৭ থেকে ৩১.১২.২০০৭ পর্যন্ত আগস্ট ----- ১৩দিন সেপ্টেম্বর -- ২৫দিন অক্টোবর --- ১৬ দিন নভেম্বর ---- ১১ দিন ডিসেম্বর --- ১২ দিন **মোট ------৭৭ দিন**	**গদ্য** ▪ পায়ের নিচে এভারেস্ট ▪ মহান বিজ্ঞানী জগদীশ ▪ জীবনের জন্য ▪ ইলেক্ট্রনিক্স এর যাদুর ছোঁয়ায়	৭ ১১ ৫ ৬		

	কবিতা			
	■ নোলক	৩		
	■ জীবনের হিসাব	৩		
	■ মানুষ জাতি	৪		
	■ হে কিশোর শোন	৪		
	■ পর্যালোচনা	৪		
	■ পরীক্ষা	১৩		
		১২		
	মোট	**৭৭ দিন।**		

বিশেষ দ্রষ্টব্য : সংশ্লিষ্ট গদ্য কিংবা কবিতা পাঠদানের মধ্যে শব্দার্থ, পাঠ পরিচিতি, লেখক পরিচিতি ও অনুশীলন অন্তর্ভুক্ত করে পাঠদানের পিরিয়ড সংখ্যা নির্ধারণ করা হয়েছে।

পর্ব-গ

আপনি নিজে উত্তর প্রস্তুত করুন। উত্তরটি আপনার সতীর্থকে দেখান এবং আলোচনা করে আরও উন্নত করুন। প্রয়োজনে টিউটরের সহায়তা নিন।

ইউনিট -১০ **অধিবেশন-২**

তত্ত্বাবধান

ভূমিকা

একটি দেশের অর্থনৈতিক, সাংস্কৃতিক, সামাজিক এমনকী রাজনৈতিক উন্নয়নসহ সার্বিক উন্নয়ন নির্ভর করে সে দেশের শিক্ষা ব্যবস্থার উপর। আর এই শিক্ষাদানের গুরু দায়িত্ব ন্যস্ত থাকে শিক্ষকের উপর। একজন শিক্ষক শিক্ষা গ্রহণের সুষ্ঠু পরিবেশ তৈরি করেন। এই পরিবেশ তৈরির জন্য তার যথাযথ যোগ্যতা থাকা দরকার। আবার যোগ্যতা থাকলেও অনেক সময় শিক্ষাদান সম্ভব হয় না। সেক্ষেত্রে প্রয়োজন শেখানোর দক্ষতার মান উন্নয়ন। শিক্ষককে ধীরে ধীরে যোগ্যতা উন্নয়ন এবং তার শিক্ষাদানের মান বাড়ানোর ক্ষেত্রে সক্রিয় সাহায্য ও সহযোগিতা প্রদানকে তত্ত্বাবধায়ন বলা হয়। আমরা এ অধিবেশনে তত্ত্বাবধায়ন নিয়ে আলোচনা করবো।

উদ্দেশ্য

এ অধিবেশন শেষে আপনি–

- তত্ত্বাবধানের সংজ্ঞা এবং পুরাতন ও আধুনিক ধারণা সম্পর্কে ব্যাখ্যা করতে পারবেন।
- তত্ত্বাবধানের প্রয়োজনীয়তা ও ধাপসমূহ ব্যাখ্যা করতে পারবেন।
- তত্ত্বাবধান ব্যবস্থা উন্নয়নের সুপারিশসমূহ প্রণয়ন করতে পারবেন।

পর্বসমূহ

পর্ব-ক : তত্ত্বাবধান এবং এর পুরাতন ও আধুনিক ভাবধারা

তত্ত্বাবধানের অন্তর্নিহিত অর্থ হলো নিবিড় পর্যবেক্ষণ, নিয়ন্ত্রণ ও নির্দেশনা প্রদানপূর্বক কোন কাজের সার্বিক দিকের প্রতি দৃষ্টিদান। পূর্বে তত্ত্বাবধায়ক বিশ্বাস করতেন শিক্ষার উন্নয়নের জন্য প্রয়োজন শিক্ষককে সতর্কভাবে নিয়ন্ত্রণ এবং পরিচালিত করা। শিক্ষকরা তত্ত্বাবধায়ককে একজন উপরওয়ালা বা বাইরের লোক বলে মনে করতেন। তাদের আচরণে তারা তাকে বন্ধু হিসাবে ভাবতে পারতেন না। কিন্তু বর্তমানে যুগের আধুনিক, গণতান্ত্রিক ও সৃজনশীল তত্ত্বাবধানের দর্শনে তত্ত্বাবধায়ক হলেন শিক্ষকদের ‘Friend, Philosopher and Guide’ অর্থাৎ শিক্ষকের ‘বন্ধু, দার্শনিক ও প্রদর্শক’।

তাহলে আসুন বন্ধুরা এবার আমরা তত্ত্বাবধানের পুরাতন ও আধুনিক ভাবধারার কিছু বৈশিষ্ট্য লিপিবদ্ধ করি।

তত্ত্বাবধান ও এর আধুনিক ও পুরাতন ভাবধারা

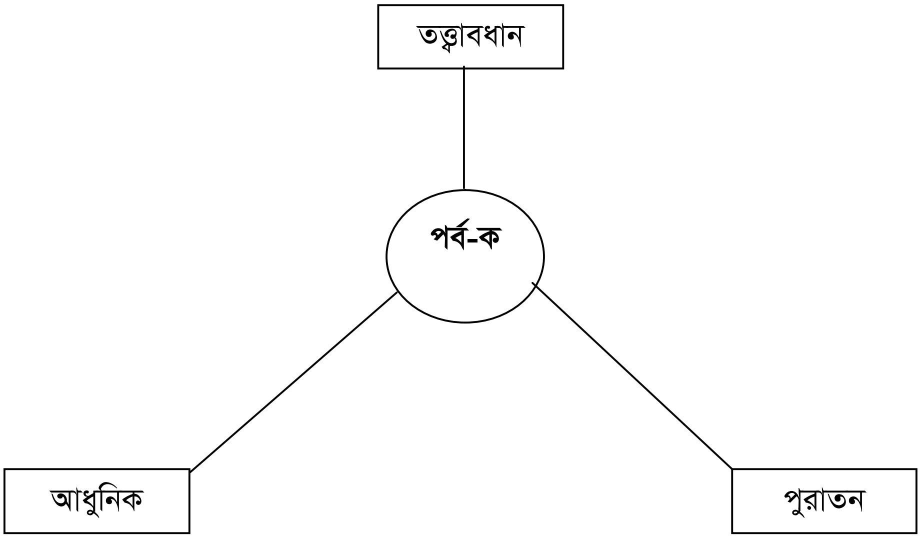

আধুনিক ধারণা	পুরাতন ধারণা
১.	১.
২.	২.
৩.	৩.

পর্ব-খ : তত্ত্বাবধানের প্রয়োজনীয়তা ও ধাপসমূহ

শুধু শিক্ষাক্ষেত্রে নয়, শিক্ষণ-শিখন প্রক্রিয়ায়ও তত্ত্বাবধানের ভূমিকা অত্যন্ত গুরুত্বপূর্ণ। বিদ্যালয়ের সঠিক শিখন ও শিক্ষণ পরিবেশ তৈরি এবং তা অক্ষুণ্ণ রাখার ক্ষেত্র তত্ত্বাবধানের যথেষ্ট প্রয়োজনীয়তা রয়েছে। শিক্ষাকে গতিশীল করে সমাজের জন্য অধিক কল্যাণকর এবং অর্থবহ করার জন্য শিক্ষাক্ষেত্রে সঠিক দিক নির্দেশনা প্রদান ও মূল্যায়নের প্রয়োজন। শিক্ষা

ব্যবস্থাকে মূল্যায়ন করে সঠিক দিক নির্দেশনা করার ক্ষেত্রে তত্ত্বাবধানের যথেষ্ট প্রয়োজনীয়তা রয়েছে।

তত্ত্বাবধানের ধাপগুলো হলো

পরিচিত হওয়া, পর্যবেক্ষণ, কনফারেন্স, শ্রেণিকক্ষ পর্যবেক্ষণ, কনফারেন্সের জন্য প্রস্তুতি, পর্যবেক্ষণ পরবর্তী কনফারেন্স।

পর্ব-গ : তত্ত্বাবধান ব্যবস্থা উন্নয়নের জন্য সুপারিশমালা

তত্ত্বাবধান কার্যক্রমকে সম্প্রসারণ, আধুনিকীকরণ ও গতিশীল করা প্রয়োজন। আধুনিক তত্ত্বাবধান ব্যবস্থাপনা গড়ে তোলার জন্য নিম্নে বর্ণিত পদক্ষেপগুলো গ্রহণ করা যেতে পারে:

১। উন্নত দেশগুলোর মত আমাদের দেশের তত্ত্বাবধান ব্যবস্থাকে শিক্ষা প্রশাসন সংগঠনের একটি বিশেষ উপ-সংগঠন হিসাবে গড়ে তোলা আবশ্যক। শিক্ষার মান উন্নয়নের জন্য দু’ ধরনের তত্ত্বাবধায়ক প্রয়োজন, যথা- বিদ্যালয় পরিচালনা ও আর্থিক ব্যবস্থা দেখাশুনার দায়িত্বে থাকবেন প্রশাসনিক তত্ত্বাবধায়কগণ এবং শিক্ষামূলক তত্ত্বাবধায়কমণ্ডলীর কাজ হবে শিক্ষকদের আত্মচেষ্টায় দক্ষতা বৃদ্ধির জন্য পরামর্শ দান, শিক্ষা সমস্যা সমাধানে শিক্ষকদের নেতৃত্ব প্রদান, শিক্ষা বিষয়ক গবেষণা কাজ পরিচালনা ইত্যাদি।

২। তত্ত্বাবধান কাজে নিয়োজিত বিভিন্ন সংস্থার কর্মকর্তাদের কাজের পুনরাবৃত্তি রোধকল্পে বিভিন্ন সংস্থার দায়িত্বাবলি ও ক্ষমতা সুনির্দিষ্ট করা প্রয়োজন। এছাড়া প্রশাসনিক ব্যবস্থার সুষ্ঠু পরিচালনার জন্য সংশ্লিষ্ট অধিদপ্তর, পরিদপ্তর, একই অধিদপ্তরের বিভিন্ন বিভাগ ও দপ্তর, বিদ্যালয় এবং শিক্ষা বোর্ডসমূহের কাজের মধ্যে সহযোগিতা ও সমন্বয়সাধনের ব্যবস্থা নেয়া প্রয়োজন।

৩। আমাদের দেশে অধিকাংশ বিদ্যালয়ের শিক্ষক সংখ্যা সরকার নির্ধারিত ন্যূনতম সংখ্যার চেয়ে কম হওয়ায় একজন শিক্ষককে একাধিক বিষয়ে পাঠদান করতে হয়। আবার কিছু কিছু বিষয়ের দক্ষ শিক্ষকের অভাব রয়েছে। এ সকল ক্ষেত্রে পারদর্শী তত্ত্বাবধায়কের মাধ্যমে উপযুক্ত প্রশিক্ষণ ও তত্ত্বাবধানের মাধ্যমে শিক্ষকদের বিভিন্ন বিষয়ের দক্ষ শিক্ষক হিসাবে গড়ে তোলা সম্ভব।

৪। জেলা ও থানা পর্যায়ে মাধ্যমিক বিদ্যালয়ের শিক্ষার মান উন্নয়নের জন্য পর্যাপ্ত সংখ্যক তত্ত্বাবধায়কের পদ সৃষ্টি করা প্রয়োজন, যাতে প্রতিটি বিদ্যালয়ে নিয়মিত তত্ত্বাবধান কাজ পরিচালনা করা সম্ভব হয়। তাছাড়া আতাউর রহমান খান শিক্ষা রিপোর্টেও (১৯৫৭) বলা

হয়েছিল উন্নত তত্ত্বাবধানের লক্ষ্যে তৎকালীন মহকুমা তত্ত্বাবধায়কের গেজেটেড পদ সৃষ্টি করার জন্য।

৫। তত্ত্বাবধায়কগণ যাতে সফলভাবে আধুনিক বিশ্বের অনুরূপ তত্ত্বাবধানমূলক দায়িত্ব পালন করতে পারেন সেজন্য তাদের চাকুরিপূর্ব ও নিয়মিত চাকুরিকালীন প্রশিক্ষণের ব্যবস্থা করা প্রয়োজন।

৬। তত্ত্বাবধায়কমণ্ডলীর তত্ত্বাবধান কাজ পরিচালনার জন্য বিস্তৃত ও যুগোপযোগী শিক্ষা কোড প্রণয়নের ব্যবস্থা গ্রহণ করা উচিত। এখানে উল্লেখ্য যে ১৯৩১ সালে প্রণীত "এডুকেশন কোড" পরবর্তীকালে আর কোন পরিমার্জন করা হয়নি।

৭। প্রতিটি বেসরকারি বিদ্যালয়ে বাধ্যতামূলক ম্যানেজিং কমিটি গঠনের বিধি রয়েছে। এই কমিটির সদস্যবৃন্দকে প্রশিক্ষণপ্রাপ্ত তত্ত্বাবধায়কের মাধ্যমে প্রশিক্ষণ প্রদান করে নিজ নিজ বিদ্যালয়ে নিয়মিত তত্ত্বাবধানের দায়িত্ব পালনের ব্যবস্থা করা যেতে পারে।

শিক্ষার্থীবৃন্দ, এবার আমরা এ সুপারিশমালাকে নিম্নের ছকে সাজানোর চেষ্টা করি -

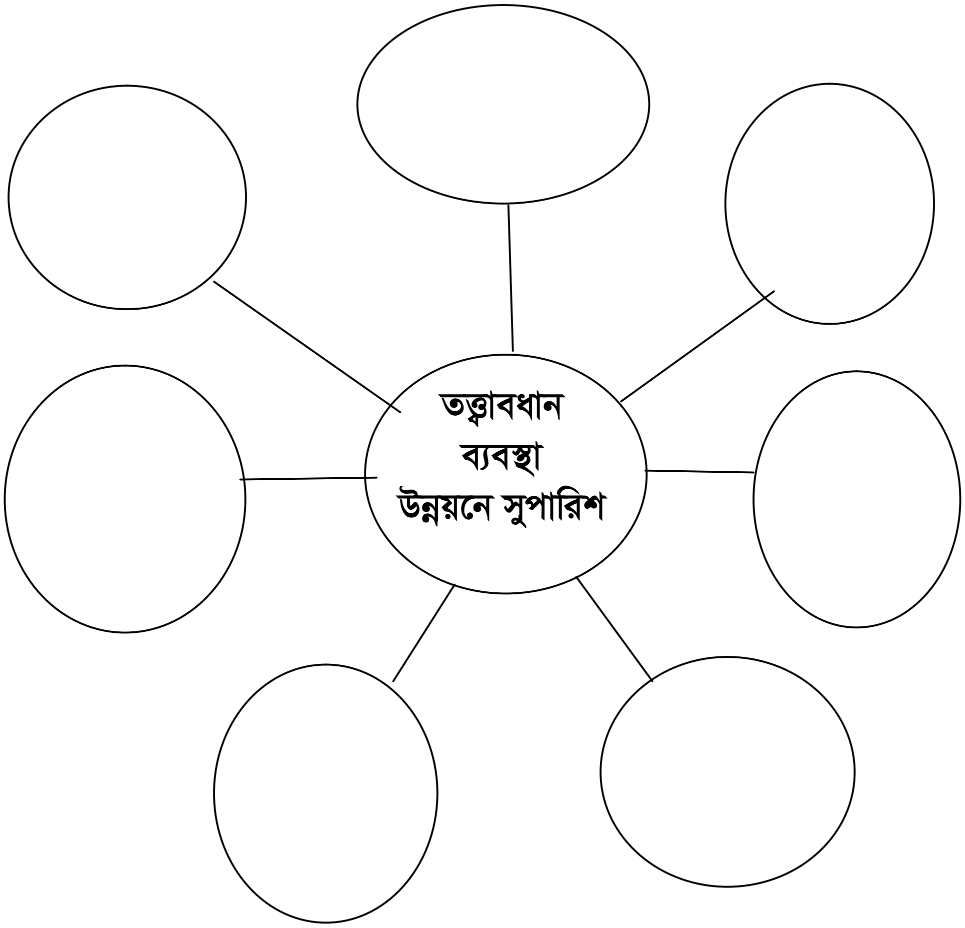

ইউনিট-১০ **অধিবেশন-২**

মূল শিখনীয় বিষয়

তত্ত্বাবধান

একটি দেশের অর্থনৈতিক, সাংস্কৃতিক, সামাজিক, এমনকি রাজনৈতিক উন্নয়নসহ সার্বিক উন্নয়ন নির্ভর করে সে দেশের শিক্ষা ব্যবস্থার উপর। আর এই শিক্ষাদানের গুরু দায়িত্ব ন্যস্ত থাকে শিক্ষকের উপর। একজন শিক্ষক শিক্ষা গ্রহণের সুষ্ঠু পরিবেশ তৈরি করেন। এই পরিবেশ তৈরির জন্য তাঁর যথাযথ যোগ্যতা থাকা দরকার। আবার যোগ্যতা থাকলেও অনেক সময় শিক্ষাদান সম্ভব হয় না। সেক্ষেত্রে প্রয়োজন শেখানোর দক্ষতার মান উন্নয়ন। শিক্ষককে ধীরে ধীরে যোগ্যতা উন্নয়ন এবং তাঁর শিক্ষাদানের দক্ষতার মান বাড়ানোর সক্রিয় সাহায্য ও সহযোগিতা প্রদানকে একাডেমিক তত্ত্বাবধান বলে।

গ্রীক দার্শনিক প্লেটো এবং সক্রেটিস বলেছেন, "শিশুর জ্ঞানের পূর্ণ বিকাশসাধন করাই হচ্ছে শিক্ষা", প্রতিটি শিশু ভিন্নতর প্রকৃতির এবং নিজস্ব সত্ত্বার অধিকারী। এদের জন্য প্রয়োজন কেবল একজন সঠিক পথ প্রদর্শক।

মায়ের কোলে বন্যা (বাঁয়ে) ও সিডর। মা ও সন্তান দুজনের মুখেই হাসি
সূত্রঃ প্রথম আলো ২৮/১১/০৭

প্রশিক্ষক ছবিগুলো দেখিয়ে বলবেন একজন শিশুর জীবনে সবচেয়ে নিরাপদ জায়গা হল মায়ের কোলে। মায়ের কোলে শিশুটির হাসি মুখ। এই মায়ের তত্ত্বাবধানেই শিশুটি একদিন বড় হয়ে

উঠবে, যেমনিভাবে সযত্নে বেড়ে ওঠে একটি চারা গাছ। তাছাড়া যিনি শিশুর অন্তর্নিহিত সম্ভাবনাময় প্রতিভার স্ফুরণ ঘটিয়ে শিশুকে একজন পরিণত মানুষে রূপ দিতে সক্ষম হবেন। তিনি হলেন শিক্ষক। তাই শিক্ষকের প্রয়োজন শিক্ষাদানের প্রয়োজনীয় কলাকৌশল জানা ও প্রয়োজনীয় প্রশিক্ষণ। তাই আমাদের জানতে হবে তত্ত্বাবধান কী?(What is supervision), ইংরেজি supervision শব্দের আভিধানিক বাংলা শব্দ তত্ত্বাবধান SAMSAD English Bengali Dictionary (১৯৭১) ১১৩৬ পৃষ্ঠায় Supervision কে অন্যতম যে অর্থে ব্যবহার করা হয়েছে তা হল "অবেক্ষণ"। অতএব অভিধান অনুযায়ী তত্ত্বাবধান ও অবেক্ষণ Supervision শব্দের দু'টি ভিন্ন ভিন্ন শব্দার্থ। তত্ত্বাবধান হল কোন কিছু দেখা বা তদারকি করা। কোন কাজ সূচারুরূপে সম্পন্ন হচ্ছে কিনা। সঠিক পরিকল্পনা ও নিয়মনীতি অনুসারে হচ্ছে কী না তা পর্যবেক্ষণ করা এবং প্রয়োজনে নতুন কৌশল গ্রহণ করার নামই তত্ত্বাবধান।

তত্ত্বাবধান একটি যৌগিক শব্দ। এর ইংরেজি প্রতিশব্দ হলো Supervision। এখানে Super শব্দটির অর্থ হলো অধিক, আর Vision শব্দটির অর্থ হলো দেখা। সুতরাং Supervision অর্থ হলো অধিক হারে দেখা। অর্থাৎ তাৎপর্যভাবে যদি আমরা দেখি তাহলে Supervision শব্দটির অর্থ হলো অধিদর্শন। এখানে একজন ব্যক্তির সার্বক্ষণিক উপস্থিতি ছাড়াও নির্দেশনা এবং নিয়ন্ত্রণকে বুঝায়। আর তত্ত্বাবধানের আভিধানিক অর্থ যদি আমরা দেখি তাহলে তত্ত্বাবধান হলো সোজা ভাষায় কোন কিছু দেখা বা তদারকি করা। তত্ত্বাবধানের অন্তর্নিহিত অর্থ হলো- নিবিড় পর্যবেক্ষণ, নিয়ন্ত্রণ ও নির্দেশনা প্রদান পূর্বক কোন কাজের সার্বিক দিকের প্রতি দৃষ্টিদান। তত্ত্বাবধানকে বিভিন্ন লেখক বিভিন্ন দৃষ্টিকোণ থেকে সংজ্ঞায়িত করেছেন। ধ্রুপদী লেখক Barr and Burton এর মতে, "তত্ত্বাবধানের মূল উদ্দেশ্য শিক্ষা কাজের উন্নতি সাধন করা"। Ayer এর মতে, "তত্ত্বাবধান কার্যক্রমের প্রধান লক্ষ্য শিক্ষণ প্রক্রিয়ার উন্নতি এবং এর মাধ্যমে শিখনের উন্নতি সাধন করা"।

শিক্ষামূলক তত্ত্বাবধান

তত্ত্বাবধান

শিক্ষা ব্যবস্থাকে সুনিয়ন্ত্রিত উপায়ে মনোবৈজ্ঞানিক পদ্ধতিতে পরিচালিত করে শিক্ষার্থীদের দক্ষ জনশক্তিতে পরিণত করার কাজে নিয়োজিত ব্যক্তিবর্গকে শিক্ষা উন্নয়নের সকল কলাকৌশল বা প্রক্রিয়া অনুসরণ করার ক্ষেত্রে দিক নির্দেশনা দানকেই বলা হয় শিক্ষামূলক তত্ত্বাবধান।

আবার, সঠিকভাবে শ্রেণিকক্ষে পাঠদান কাজ পরিচালিত হচ্ছে কী না, তা লক্ষ্য করাকেও বলা হয় শিক্ষামূলক তত্ত্বাবধান, Harold Spears বলেন "Supervision is the process of bringing about improvement in instruction by working with people who are

working with pupils. Supervision is a process of stimulations growth and a means of helping teachers to help themselves.”

Harold Spears তার Improving the supervision of instruction বই এ তত্ত্বাবধানকে শিক্ষাদান কার্যক্রমের উন্নতির মাধ্যমে শিক্ষার্থীর কার্যকর শিক্ষাগ্রহণ এবং সার্বিক বিকাশে সহায়তা দানকে বুঝিয়েছেন।

W.H. Nuff শিক্ষামূলক তত্ত্বাবধান বলতে যা বলেন, পরিদর্শনমূলক দক্ষ কাজ যা শিক্ষা কার্যক্রমে উন্নতি বিধানকল্পে নির্দেশ প্রদান করে।

Morris L. Cogan তত্ত্বাবধানের ওপর পরীক্ষা নিরীক্ষা চালিয়ে তত্ত্বাবধানের দুটি পৃথক অংশ যথা সাধারণ ও ক্লিনিক্যাল তত্ত্বাবধানের উল্লেখ করেন। এখানে সাধারণ বা প্রশাসনিক তত্ত্বাবধান(General or administrative) বলতে শিক্ষণ ও শিখন কার্যক্রমের সাথে সংশ্লিষ্ট আনুষঙ্গিক কর্মকাণ্ডের উন্নয়নকে বুঝিয়েছেন। প্রশাসনিক তত্ত্বাবধান প্রশাসনিক কর্মকর্তা দ্বারা সম্পাদিত হতে পারে আবার তার নির্দেশে অন্য যে কেউও তা করতে পারেন। অন্য দিকে তিনি ক্লিনিক্যাল তত্ত্বাবধান দ্বারা একান্তভাবে শ্রেণিকক্ষে একজন বা একদল শিক্ষকের সাথে শিক্ষার্থীদের একক বা দলগত ভাবের আদান প্রদানকে বুঝিয়েছেন। এক কথায় বলা যায় শিক্ষা ক্ষেত্রে সৃষ্ট সমস্যা সমাধানের লক্ষ্যে যে দিক নির্দেশনা প্রদান করা হয়, তাই হচ্ছে শিক্ষামূলক তত্ত্বাবধান। কর্তব্যরত শিক্ষকের জন্য সহযোগিতার বাণী বয়ে নিয়ে যাওয়াই হচ্ছে শিক্ষামূলক তত্ত্বাবধান। তবে যেভাবে বা যতভাবেই একে সংজ্ঞায়িত করি না কেন, এর মূল উদ্দেশ্য হচ্ছে শিক্ষার সার্বিক মানোন্নয়ন।

শিক্ষামূলক তত্ত্বাবধানের পুরাতন ও আধুনিক ভাবধারা

তত্ত্বাবধানের আধুনিক ধারণা অধিকতর ব্যাপক ও অর্থবহ। ঐতিহাসিক তত্ত্বাবধান কর্মকাণ্ড শিক্ষক ও শ্রেণিকক্ষকে কেন্দ্র করে আবর্তিত হত। পূর্বে তত্ত্বাবধায়কের আচরণ ছিল বহুলাংশে পুলিশী মনোভাবাপন্ন। তখন পরিদর্শকের কাজের প্রধান উদ্দেশ্য ছিল শিক্ষকের দোষত্রুটি খুঁজে বের করা। এক্ষেত্রে শিক্ষকদেরকে প্রশাসনের লেজুড় হিসেবে ধরা হয় এবং তাদেরকে প্রশাসনের ইচ্ছা মতো কাজ করার জন্য নিয়োগ করা হয়েছে বলে ভাবা হয়। প্রভূত্বমূলক প্রশাসনে পরিদর্শন ও শিক্ষকদের মধ্যেকার সম্পর্ক উপরস্থ-অধীনস্থের। পরিদর্শক শিক্ষকের কাজ পরীক্ষা করেন, বিচার করেন, ভুল ধরেন ও শিক্ষার্থীদের অকৃতকার্যতার জন্য তাকে দায়ী করেন। শিক্ষককে তার কাজে বহাল থাকার জন্য কী করতে হবে তার নির্দেশ দেন। আসলে প্রভূত্বমূলক পরিদর্শনে বিদ্যালয় শিক্ষার ব্যাপারে শিক্ষকদের কাছে সিদ্ধান্ত আসে উপর থেকে। এখানে শিক্ষকদেরকে

পেশাগত যোগ্যতাসম্পন্ন ব্যক্তি বলে মনে করা হয় না। যদিও তারা পেশাগত যোগ্যতাসম্পন্ন ব্যক্তি।

বিংশ শতকের গোড়ার দিকে অনেক দেশে এ ধরনের বিদ্যালয় পরিদর্শন প্রচলিত ছিল। অন্যদিকে বৃটিশ শাসনামলে এই উপমহাদেশে বিদ্যালয়ে কাজ তদারকের জন্য এ ধরনের পরিদর্শন ব্যবস্থা চালু করা হয়। পরবর্তীকালে আমাদের দেশে চালু হয়েছে। বর্তমানে যদিও বিদ্যালয় পরিদর্শন সম্পর্কিত নতুন কিছু সরকারি আদেশ জারি হয়েছে তবুও মূল কাঠামো হিসাবে The Bengal Education Code ১৯৩১ এখনো চালু আছে। তাই আমাদের দেশে আজও প্রভূত্বমূলক পরিদর্শনই মুখ্য বলা যায়।

বর্তমান যুগের আধুনিক, গণতান্ত্রিক ও সৃজনশীল তত্ত্বাবধানের দর্শনে তত্ত্বাবধায়ক হলেন শিক্ষকের Friend, Philosopher and Guide অর্থাৎ তিনি শিক্ষকের বন্ধু, দার্শনিক ও পথ প্রদর্শক। গণতান্ত্রিক প্রশাসনিক (Democratic administration) ধারণার বিকাশের মধ্য দিয়ে মানবিক সম্পর্কের পরিদর্শন ধারণা জন্ম লাভ করে। এই প্রকার পরিদর্শনে শিক্ষকের ব্যক্তিসত্তার প্রতি মর্যাদা প্রদান করে স্বীয় অধিকারে প্রত্যেককে একজন পূর্ণ ব্যক্তিত্বসম্পন্ন লোক বলে গণ্য করা যায়। এখানে তত্ত্বাবধায়কের দায়িত্ব হল ব্যক্তিত্বের প্রতি সম্মান দিয়ে শিক্ষকের প্রতি আগ্রহ প্রদর্শন করে তার ভেতর সন্তুষ্টির অনুভূতি সৃষ্টি করা।

শিক্ষাক্ষেত্রে শিক্ষামূলক তত্ত্বাবধানের প্রয়োজনীয়তা

তত্ত্বাবধানের প্রয়োজনীয়তা

শুধু শিক্ষাক্ষেত্রেই নয়, শিখন প্রক্রিয়ায়ও তত্ত্বাবধানের ভূমিকা গুরুত্বপূর্ণ। বিদ্যালয়ের সঠিক শিখন ও শিক্ষণ পরিবেশ তৈরি এবং তা অক্ষুন্ন রাখার ক্ষেত্রে তত্ত্বাবধানের যথেষ্ট প্রয়োজনীয়তা রয়েছে। শিক্ষাকে গতিশীল করে সমাজের জন্য অধিক কল্যাণকর এবং অর্থবহ করার জন্য শিক্ষাক্ষেত্রে সঠিক দিক নির্দেশনা ও মূল্যায়নের প্রয়োজন। শিক্ষা ব্যবস্থাকে মূল্যায়ন করে সঠিক দিক নির্দেশনা প্রদান করার ক্ষেত্রে তত্ত্বাবধান ও তত্ত্বাবধায়কের যথেষ্ট প্রয়োজনীয়তা রয়েছে। নিম্নে প্রধান প্রধান গুরুত্ব তুলে ধরা হলো।

১। **বিদ্যালয়ের শিখন কার্য সম্পাদন হচ্ছে কী না তা তদারক করা :** শিখন নির্ভর করে শিক্ষকের শিক্ষাদান প্রক্রিয়ার ওপর। তাছাড়া শিক্ষকের প্রশিক্ষণের উপর। তাই শিক্ষকের উপর তত্ত্বাবধান করে শিখন বাস্তবায়নের জন্য তত্ত্বাবধানের গুরুত্ব অপরিসীম।

২। **পাঠ-পরিকল্পনা তৈরি :** শিক্ষক শিখন-শেখানো কার্যক্রম শ্রেণিকক্ষে উপস্থাপন করার সময় পাঠ পরিকল্পনা তৈরি করে কী না বা তা অনুসরণ করে থাকে কী না তা তত্ত্বাবধানের মাধ্যমে সমস্যা চিহ্নিতকরণ ও সমাধান করে পাঠ-পরিকল্পনা তৈরি ও ব্যবহার নিশ্চিত করা সম্ভব।

৩। **শিক্ষাক্রমের উপযুক্ততা বিচার :** কোন স্তরের শিক্ষাক্রমের চাহিদা বা বাস্তবতা নির্ভর করে শিক্ষার্থীর বয়স, চাহিদা, গ্রহণ ক্ষমতা ইত্যাদির উপর। যদি চাহিদা, বয়স ও গ্রহণ ক্ষমতার সাথে শিক্ষাক্রমের মিল না থাকে, তাহলে শিক্ষার লক্ষ্য ও উদ্দেশ্য বাস্তবায়ন হবে না। এই সমস্যা তত্ত্বাবধানের মাধ্যমে জানা যায়।

৪। **শিক্ষক-প্রশিক্ষণের প্রয়োজনীয়তা :** শিখন-শেখানো কার্যক্রম ফলপ্রসূভাবে চালানোর জন্য প্রশিক্ষণের বিকল্প নাই। কোন বিদ্যালয়ের শিক্ষাদান কার্যক্রম পরিকল্পনা মাফিক হচ্ছে কী না ও কেন হচ্ছে না এর কারণ তত্ত্বাবধানের মাধ্যমে নির্ণয় করা সম্ভব এবং এই কারণে বা সমস্যা সমাধানের জন্য শিক্ষক প্রশিক্ষণ দরকার আছে কী না তা জানা ও প্রয়োজনে ব্যবস্থা গ্রহণ করা যায়।

৫। **শিক্ষামূলক ব্যবস্থা জোরদার করা:** শিক্ষামূলক ব্যবস্থা জোরদার করার জন্য তত্ত্বাবধানের প্রয়োজনীয়তা রয়েছে। তত্ত্বাবধায়ক তত্ত্বাবধানের মাধ্যমে জোরদারমূলক ব্যবস্থা গ্রহণের সূত্র খুঁজে পান।

তাছাড়া তত্ত্বাবধায়নের মাধ্যমে আরও যা করা সম্ভব তা হল:

- শিক্ষকদের পেশাগত উন্নয়নের জন্য ইতিবাচক মানসিকতা গঠন করা
- শিক্ষাদান সংক্রান্ত কৌশলসমূহ উন্নয়নে সহায়তা করা
- শিক্ষকের দুর্বল দিকগুলো চিহ্নিত করে কারণ শনাক্ত করা এবং উন্নয়নের পথ বাতলিয়ে দেওয়া ও পরিবীক্ষণের মাধ্যমে উন্নয়ন সাধন করা
- শিক্ষাদান পদ্ধতির উন্নয়নের জন্য শিক্ষকগণকে বিশেষজ্ঞ পর্যায়ে সহায়তা করা
- শিক্ষকের শেখানোর কৃতিত্ব যাচাই করতে সাহায্য করা ও এ ব্যাপারে সহায়তা করা
- শিক্ষকের দক্ষতা পরিমাপের জন্য উপযুক্ত সূচকের ব্যবহার করা
- প্রধান শিক্ষক, বিষয় শিক্ষক, তত্ত্বাবধায়ক এবং এসএমসি এর কাজের সমন্বয় ঘটিয়ে শিক্ষকের যোগ্যতা ও শিক্ষাদান পদ্ধতির উন্নয়ন সাধন করা

সাধারণভাবে তত্ত্বাবধান কার্যক্রমের লক্ষ্য শিক্ষকের পেশাগত দক্ষতা, শিক্ষাদানের কলাকৌশল, শিক্ষকের আত্মবিশ্বাস বৃদ্ধি করে তার শিক্ষাদানের উৎকর্ষ সাধন করা।

একাডেমিক তত্ত্বাবধানের প্রকারভেদ

একাডেমিক তত্ত্বাবধান তিন ধরনের:

১। **নিয়ম সংশ্লিষ্ট :** কর্তৃপক্ষের নীতিমালা, কাজের মান, নৈতিকতা, চুক্তি ইত্যাদি ঠিক রাখার জন্য শিক্ষক বা অধীনস্থদের প্রতি নজর রাখা এবং যথাযথভাবে কাজ আদায় করে নেওয়া।

২। **গঠন সংশ্লিষ্ট :** তত্ত্বাবধায়কের অধীনস্থ ব্যক্তি/শিক্ষক কাজ করে নতুন অভিজ্ঞতা ও যোগ্যতা অর্জন করবে এবং শিক্ষাদান/কার্যক্ষেত্রে তা প্রয়োগ করে নিজের যোগ্যতা ও দক্ষতা বাড়াবে।

৩। **সংশোধনীমূলক :** তত্ত্বাবধায়ক বা কর্মকর্তা শিক্ষকের কাজ পর্যবেক্ষণ করবেন, দুর্বল জায়গাগুলো চিহ্নিত করে কারণগুলো শনাক্ত করবেন এবং সংশোধনীমূলক উপদেশ, কর্মপদ্ধতি প্রয়োগ ইত্যাদির মাধ্যমে শিক্ষক/কর্মীদের উজ্জীবিত করে সংশোধন করবেন। এ পদ্ধতি ধারাবাহিকভাবে চলতে থাকবে।

একাডেমিক তত্ত্বাবধানের ধাপসমূহ

(ক) **পরিচিত হওয়া :** কী পরিবেশে পর্যবেক্ষণ করা হবে তা সংশ্লিষ্টদের জানিয়ে দেওয়া।

(খ) **পর্যবেক্ষণপূর্ব কনফারেন্স :** পর্যবেক্ষণপূর্ব আলোচনায় নিম্নলিখিত বিষয়সমূহ সম্পর্কে একমত হতে হবে :

- কী পর্যবেক্ষণ করা হবে
- কী ধরনের তথ্য সংগ্রহ করা হবে
- কীভাবে তথ্য সংগ্রহ করা হবে
- পর্যবেক্ষণ চলাকালে অনুসৃত নিয়মনীতি
- তত্ত্বাবধায়ককে জানতে হবে বিষয় ও শিক্ষা গ্রহণের উদ্দেশ্য ও পাঠ পরিকল্পনা।

(গ) **শ্রেণিকক্ষ পর্যবেক্ষণ:**

- শিক্ষক ও শিক্ষার্থীর কার্যক্রম পর্যবেক্ষণ
- পূর্ব নির্ধারিত প্রয়োজনীয় তথ্য সংগ্রহ

(ঘ) **কনফারেন্সের জন্য প্রস্তুতি:**

- শ্রেণিকক্ষ পর্যবেক্ষণের সময় তথ্য বিশ্লেষণ
- পর্যবেক্ষণ পরবর্তী কনফারেন্সে আলোচনার জন্য বিশেষ বিশেষ পয়েন্ট নির্বাচন

(ঙ) **পর্যবেক্ষণ পরবর্তী কনফারেন্স**

- পর্যবেক্ষণ ও চিন্তা চেতনায় অংশগ্রহণ
- সম্ভাব্য উন্নতি সম্বন্ধে আলোচনা
- পরবর্তী তত্ত্বাবধানের জন্য লক্ষ্য নির্বাচন
- লক্ষ্য অর্জনের জন্য পরিকল্পনা প্রণয়ন

শিক্ষাক্ষেত্রে শিক্ষামূলক তত্ত্বাবধান ব্যবস্থা উন্নয়নের সুপারিশমালা

সুপারিশমালা

তত্ত্বাবধান কার্যক্রমকে সম্প্রসারণ, আধুনিকীকরণ ও গতিশীল করা প্রয়োজন। আধুনিক তত্ত্বাবধান ব্যবস্থাপনা গড়ে তোলার জন্য নিম্নে বর্ণিত পদক্ষেপগুলো গ্রহণ করা যেতে পারে:

১। উন্নত দেশগুলোর মত আমাদের দেশের তত্ত্বাবধান ব্যবস্থাকে শিক্ষা প্রশাসন সংগঠনের একটি বিশেষ উপ-সংগঠন হিসাবে গড়ে তোলা আবশ্যক। শিক্ষার মান উন্নয়নের জন্য দু' ধরনের তত্ত্বাবধায়ক প্রয়োজন। যথা: বিদ্যালয় পরিচালনা ও আর্থিক ব্যবস্থা দেখাশুনার দায়িত্বে থাকবেন প্রশাসনিক তত্ত্বাবধায়কগণ এবং শিক্ষামূলক তত্ত্বাবধায়কমণ্ডলীর কাজ হবে শিক্ষকদের আত্মচেষ্টায় দক্ষতা বৃদ্ধির জন্য পরামর্শ দান, শিক্ষা সমস্যা সমাধানে শিক্ষকদের নেতৃত্ব প্রদান, শিক্ষা বিষয়ক গবেষণা কাজ পরিচালনা ইত্যাদি।

২। তত্ত্বাবধান কাজে নিয়োজিত বিভিন্ন সংস্থার কর্মকর্তাদের কাজের পুনরাবৃত্তি রোধকল্পে বিভিন্ন সংস্থার দায়িত্বাবলি ও ক্ষমতা সুনির্দিষ্ট করা প্রয়োজন। এছাড়া প্রশাসনিক ব্যবস্থার সুষ্ঠু পরিচালনার জন্য সংশ্লিষ্ট অধিদপ্তর, পরিদপ্তর, একই অধিদপ্তরের বিভিন্ন বিভাগ ও দপ্তর, বিদ্যালয় এবং শিক্ষা বোর্ডসমূহের কাজের মধ্যে সহযোগিতা ও সমন্বয় সাধনের ব্যবস্থা নেয়া প্রয়োজন।

৩। আমাদের দেশে অধিকাংশ বিদ্যালয়ের শিক্ষক সংখ্যা সরকার নির্ধারিত ন্যূনতম সংখ্যার চেয়ে কম হওয়ায় একজন শিক্ষককে একাধিক বিষয়ে পাঠদান করতে হয়। আবার কিছু কিছু বিষয়ের দক্ষ শিক্ষকের অভাব রয়েছে। এ সকল ক্ষেত্রে পারদর্শী তত্ত্বাবধায়কের মাধ্যমে উপযুক্ত প্রশিক্ষণ ও তত্ত্বাবধানের মাধ্যমে শিক্ষকদের বিভিন্ন বিষয়ের দক্ষ শিক্ষক হিসাবে গড়ে তোলা সম্ভব।

৪। জেলা ও থানা পর্যায়ে মাধ্যমিক বিদ্যালয়ের শিক্ষার মান উন্নয়নের জন্য পর্যাপ্ত সংখ্যক তত্ত্বাবধায়কের পদ সৃষ্টি করা প্রয়োজন, যাতে প্রতিটি বিদ্যালয়ে নিয়মিত তত্ত্বাবধান কাজ পরিচালনা করা সম্ভব হয়। তাছাড়া আতাউর রহমান খান শিক্ষা রিপোর্টে ও (১৯৫৭) বলা হয়েছিল উন্নত তত্ত্বাবধানের লক্ষ্যে তৎকালীন মহকুমা তত্ত্বাবধায়কের গেজেটেড পদ সৃষ্টি করার জন্য।

৫। তত্ত্বাবধায়কগণ যাতে সফলভাবে আধুনিক বিশ্বের অনুরূপ তত্ত্বাবধানমূলক দায়িত্ব পালন করতে পারেন সেজন্য তাদের চাকরিপূর্ব ও নিয়মিত চাকরিকালীন প্রশিক্ষণের ব্যবস্থা করা প্রয়োজন।

৬। তত্ত্বাবধায়কমণ্ডলীর তত্ত্বাবধান কাজ পরিচালনার জন্য বিস্তৃত ও যুগোপযোগী শিক্ষা কোড প্রণয়নের ব্যবস্থা গ্রহণ করা উচিত। এখানে উল্লেখ্য যে ১৯৩১ সালে প্রণীত "এডুকেশন কোড" পরবর্তীকালে আর কোন পরিমার্জন করা হয়নি।

৭। প্রতিটি বেসরকারি বিদ্যালয়ে বাধ্যতামূলক ম্যানেজিং কমিটি গঠনের বিধি রয়েছে। এই কমিটির সদস্যবৃন্দকে প্রশিক্ষণপ্রাপ্ত তত্ত্বাবধায়কের মাধ্যমে প্রশিক্ষণ প্রদান করে নিজ নিজ বিদ্যালয়ে নিয়মিত তত্ত্বাবধানের দায়িত্ব পালনের ব্যবস্থা করা যেতে পারে।

উপরোক্ত সুপারিশের প্রেক্ষিতে

- শিক্ষাদান পদ্ধতির গুণাগুণ ও মান উন্নয়ন হতে পারে।
- শিক্ষকদের পেশাগত দক্ষতা বৃদ্ধি পাবে।
- সামগ্রিক শিক্ষা ব্যবস্থার মান উন্নয়ন হতে পারে যাতে করে শিক্ষকগণের কার্যক্রম মূল্যায়ন পূর্বক কৃতিত্বের স্বীকৃতি দেয়া সম্ভব হবে।

মাধ্যমিক শিক্ষা তথা শিক্ষার সামগ্রিক মান উন্নয়নের জন্য উন্নত দেশগুলোর অনুসৃত তত্ত্বাবধান পদ্ধতি আমাদের দেশেও প্রবর্তনের ব্যবস্থা নেয়া উচিত যাতে শিক্ষকের শিখন-শেখানো কার্যক্রমে আসবে নতুন ধারা, আসবে নতুন কলাকৌশল আর উপকৃত হবে বিদ্যালয় এবং অগণিত শিক্ষার্থী, তত্ত্বাবধায়ক এবং তত্ত্বাবধানের অধীনস্তদের মধ্যে সৃষ্টি হবে পারস্পরিক নিবিড় সম্পর্ক।

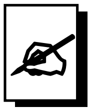

মূল্যায়ন

১. তত্ত্বাবধান কী? শিক্ষামূলক তত্ত্ববিধান বলতে কী বোঝায়? লিখুন।
২. তত্ত্বাবধানের আধুনিক ও পুরাতন ধারণার মধ্যে পার্থক্যসমূহ লিখুন।
৩. শিক্ষাক্ষেত্রে শিক্ষামূলক তত্ত্বাবধানের প্রয়োজনীয়তা ব্যাখ্যা করুন।
৪. তত্ত্বাবধান ব্যবস্থা উন্নয়নের জন্য কী কী ব্যবস্থা নেয়া যেতে পারে বলে আপনি মনে করেন। যুক্তিসহ লিখুন।

সম্ভাব্য উত্তর
পর্ব-ক

আপনি নিজে উত্তর প্রস্তুত করুন। উত্তরটি আপনার সতীর্থকে দেখান এবং আলোচনা করে আরও উন্নত করুন। প্রয়োজনে টিউটরের সহায়তা নিন।

পর্ব-গ

ইউনিট -১০ **অধিবেশন-৩**

পেশাগত উন্নয়ন

ভূমিকা

পেশাগত উন্নয়ন বিষয়টি বুঝতে ও জানতে হলে প্রথমে আমাদের বুঝা দরকার 'পেশা' কী? সাধারণত পেশা বলতে আমরা বুঝি যে কাজের মাধ্যমে একজন মানুষ তার জীবিকা নির্বাহ করে। এ অর্থে আমরা সমাজে দেখতে পাই বিভিন্ন পেশাজীবী যেমনঃ শিক্ষক, ডাক্তার, আইনবিদ ইত্যাদি। কামার, কুমার, তাঁতী, জেলে, কৃষক তারাও স্ব স্ব পেশায় নিয়োজিত এবং এর মাধ্যমে তারা জীবিকা নির্বাহ করে থাকেন। অবশ্য কোন কোন সমাজবিদের মতে 'পেশা' শব্দটির তাৎপর্য ও অন্তর্নিহিত অর্থ আরো ব্যাপক। এ অধিবেশনে আমরা এ সম্পর্কে বিস্তারিত আলোচনা করবো।

উদ্দেশ্য

এ অধিবেশন শেষে আপনি–

- পেশা কী এবং পেশা ও চাকুরির মধ্যে পার্থক্য কী চিহ্নিত করতে পারবেন।
- পেশাগত উন্নয়ন বলতে কী বোঝায় ব্যাখ্যা করতে পারবেন।
- পেশাগত উন্নয়নের উপায় ব্যাখ্যা করতে পারবেন।

পর্বসমূহ

পর্ব-ক : পেশা, পেশা ও চাকুরি

পেশা বলতে আমরা সাধারণত বুঝি যে কাজের মাধ্যমে একজন মানুষ তার জীবিকা নির্বাহ করে। কিন্তু, কোন কোন সমাজবিদের মতে 'পেশা' শব্দটির অন্তর্নিহিত অর্থ আরও ব্যাপক। পেশার সঙ্গে শুধুমাত্র আয় রোজগার বিষয়টি জড়িত নয়। যেমন- একজন ব্যাংক কর্মকর্তা, তিনি ব্যাংকে কাজ করে আয় রোজগার করেন। এটা তাঁর চাকুরি; পেশা নয়। পেশা বলতে ঐ ধরনের কাজকে বুঝায় -

- যে কাজের জন্য বিশেষ যোগ্যতা, মনোভাব ও প্রশিক্ষণ প্রয়োজন।
- যার মাধ্যমে অর্থ উপার্জন হয়।
- যে কাজ সেবামূলক; মানবতার সেবা বা কল্যাণের বিষয়টি যার সঙ্গে জড়িত।
- যে কাজে ব্যক্তির নিজস্ব ধ্যান, ধারণা ও যোগ্যতায় কাজের কৌশল, পদ্ধতি, প্রণালি পরিবর্তন / পরিমার্জন করতে ও প্রয়োগ করতে পারেন।

একজন মিল শ্রমিক, একজন প্রশাসনিক কর্মকর্তা, একজন ব্যাংক কর্মকর্তার কাজের মধ্যে প্রথম দুটি বিষয় জড়িত থাকলেও শেষ দু'টি পাওয়া যায় না, তাদেরকে নির্দিষ্ট নিয়ম পদ্ধতিতে চলতে হয়। ধরাবাঁধা আইন প্রয়োগ করতে হয় বিধায় ঐ কাজগুলো পেশা নয়।

তাহলে আসুন বন্ধুরা এবার আমরা পেশা ও চাকুরির মধ্যে কয়েকটি পার্থক্য নির্ণয়ের চেষ্টা করি -

পেশা	চাকুরি

পর্ব-খ : পেশাগত উন্নয়ন

পেশাগত উন্নয়ন বলতে পেশা সংশ্লিষ্ট বিষয়াবলি ও ব্যক্তির উন্নয়নকে বুঝায়। শিক্ষকতা একটি পেশা, অতএব এ পেশার উন্নয়ন বলতে বুঝায় :

- শিক্ষকের জ্ঞানের উন্নয়ন
- শিক্ষকের দক্ষতার উন্নয়ন
- শিক্ষকতা কাজের উন্নয়ন
- শিক্ষকতা মনোবৃত্তির উন্নয়ন।

এবার বন্ধুরা একজন শিক্ষককে কী কী বিষয়ে দক্ষ হতে হয় তা ভেবে লেখার চেষ্টা করি-

শিক্ষকের পেশাগত দক্ষতা:

পর্ব-গ : পেশাগত উন্নয়নের উপায়

শিক্ষকের পেশাগত উন্নয়ন বলতে তাঁর পেশা সংশ্লিষ্ট বিষয়াবলি ও কার্যাবলির উন্নয়নকে বুঝায়। এ উন্নয়ন ধারাবাহিক ও প্রবাহমান। ধারাবাহিক ও প্রবাহমান জ্ঞান চর্চা ও প্রশিক্ষণের মাধ্যমেই এ উন্নয়ন সম্ভব। পেশাগত উন্নয়নের জন্য পেশাগত প্রশিক্ষণের বিকল্প নেই।

এ উন্নয়নের জন্য নীতি নির্ধারক, প্রশাসক ও ব্যবস্থাপনার যেমন দায়িত্ব রয়েছে শিক্ষকের নিজেরও দায়িত্ব রয়েছে। শিক্ষককে এ ব্যাপারে সচেতন হতে হবে।

শিক্ষার্থী বন্ধুরা, এবার শিক্ষকের পেশাগত উন্নয়নের কিছু উপায় সম্পর্কে ভেবে দেখি ও নিচের ছকে লেখার চেষ্টা করি-

শিক্ষকের পেশাগত উন্নয়নের সম্ভাব্য উপায়:

ইউনিট-১০ **অধিবেশন-৩**

মূল শিখনীয় বিষয়

পেশাগত উন্নয়ন

পেশা কী ?

পেশাগত উন্নয়ন বিষয়টি বুঝতে ও জানতে হলে প্রথমে আমাদের বুঝা দরকার ‘পেশা’ কী? সাধারণত পেশা বলতে আমরা বুঝি যে কাজের মাধ্যমে একজন মানুষ তার জীবিকা নির্বাহ করে। এ অর্থে আমরা সমাজে দেখতে পাই বিভিন্ন পেশাজীবী যেমন : শিক্ষক, ডাক্তার, আইনবিদ ইত্যাদি। কামার, কুমার, তাঁতী, জেলে, কৃষক তারাও স্ব স্ব পেশায় নিয়োজিত এবং এর মাধ্যমে তারা জীবিকা নির্বাহ করে থাকেন।

দুইজন পেশাজীবী (জেলে ও কুমার)

কোন কোন সমাজবিদের মতে ‘পেশা’ শব্দটির অন্তর্নিহিত অর্থ আরও ব্যাপক। পেশার সঙ্গে শুধুমাত্র আয় রোজগার বিষয়টি জড়িত নয়। যেমন- একজন ব্যাংক কর্মকর্তা, তিনি ব্যাংকে কাজ করে আয় রোজগার করেন। এটা তাঁর চাকুরি; পেশা নয়। পেশা বলতে ঐ ধরনের কাজকে বুঝায় -

- যে কাজের জন্য বিশেষ যোগ্যতা, মনোভাব ও প্রশিক্ষণ প্রয়োজন।
- যার মাধ্যমে অর্থ উপার্জন হয়।
- যে কাজ সেবামূলক; মানবতার সেবা বা কল্যাণের বিষয়টি যার সঙ্গে জড়িত।
- যে কাজে ব্যক্তির নিজস্ব ধ্যান, ধারণা ও যোগ্যতায় কাজের কৌশল, পদ্ধতি, প্রণালি পরিবর্তন / পরিমার্জন করতে ও প্রয়োগ করতে পারেন।

একজন মিল শ্রমিক, একজন প্রশাসনিক কর্মকর্তা, একজন ব্যাংক কর্মকর্তার কাজের মধ্যে প্রথম দুটি বিষয় জড়িত থাকলেও শেষ দু'টি পাওয়া যায় না, তাদেরকে নির্দিষ্ট নিয়ম পদ্ধতিতে চলতে হয়। ধরাবাঁধা আইন প্রয়োগ করতে হয় বিধায় ঐ কাজগুলো পেশা নয়।

একজন শিক্ষককে তাঁর শিক্ষকতা কাজে জ্ঞান ও দক্ষতা অর্জন করতে হয়; প্রশিক্ষণ নিতে হয়। এর মাধ্যমে তিনি রোজগার করেন। তিনি শিক্ষার্থীদের শিক্ষাদানের মাধ্যমে গড়ে তোলেন। এটা সেবামূলক কাজ। বিভিন্ন শিক্ষার্থীর মেধা, যোগ্যতা, মানসিকতা, আচরণ বিভিন্ন। অন্য চাকরিতে যেমন নির্দিষ্ট ছকে কাজ করতে হয়, এখানে নির্দিষ্ট ছক অর্থাৎ শিক্ষাক্রম ও পাঠ্যসূচি থাকলেও তা বাস্তবায়ন ও প্রয়োগের ক্ষেত্রে বিভিন্ন শিক্ষার্থীর মানসিকতা ও আচরণিক বৈশিষ্ট্য অনুযায়ী শিক্ষকের নিজস্ব ধ্যান-ধারণা, কৌশল প্রয়োগ করতে হয়; ধরাবাঁধা শিক্ষাক্রমের পাশাপাশি আরও বহুবিধ কাজ তাকে করতে হয়। এক্ষেত্রে শিক্ষকের নিজস্ব একটি মনোভাব ও দর্শন কাজে লাগাতে হয়; তাঁর কর্মের সঙ্গে বিশেষ বৈশিষ্ট্য ও মনোভাব জড়িত - এ জন্য শিক্ষকের কাজ বা শিক্ষতা একটি পেশা।

পেশাগত উন্নয়ন

পেশাগত উন্নয়ন : পেশাগত উন্নয়ন বলতে পেশা সংশ্লিষ্ট বিষয়াবলি ও ব্যক্তির উন্নয়নকে বুঝায়। শিক্ষকতা একটি পেশা, অতএব এ পেশার উন্নয়ন বলতে বুঝায় :

- শিক্ষকের জ্ঞানের উন্নয়ন
- শিক্ষকের দক্ষতার উন্নয়ন
- শিক্ষকতা কাজের উন্নয়ন
- শিক্ষকতা মনোবৃত্তির উন্নয়ন।

ক) শিক্ষকের জ্ঞানের উন্নয়ন :

শিক্ষক জ্ঞান চর্চা করেন; জ্ঞান অর্জন করেন; জ্ঞান দান করেন। তিনি যত বেশি জ্ঞান অর্জন করতে পারবেন ততবেশি জ্ঞান দান করতে পারবেন। শিক্ষককে সারা জীবন ধরে জ্ঞান অর্জন ও বিতরণ করতে হয়। এ জন্য বলা হয় A Teacher is a lifelong student. একজন শিক্ষক সারা জীবনের জন্য ছাত্র। অতএব তাঁকে অধ্যয়ন করে জ্ঞান অর্জন করতে হবে। তাঁকে এই অধ্যয়নের সুযোগ ও পরিবেশ সৃষ্টি করে দেওয়া, অধ্যয়নে উদ্বুদ্ধ করা পেশাগত উন্নয়ন এর ব্যাপার। এ জন্য গ্রন্থাগার সমৃদ্ধ করা, অধ্যয়নের জন্য সুন্দর পরিবেশ সৃষ্টি করা ও সময় প্রদান করা উচিত।

শিক্ষক বিদ্যালয়ে শিক্ষাদানের জন্য শিক্ষার্থীদের শিক্ষাক্রমানুযায়ী যতটুকু জ্ঞান থাকা দরকার শুধু ততটুকু নয়, তাকে তার চেয়ে অনেক অধিক জ্ঞান অর্জন করতে হয়, নানাবিধ জ্ঞান অর্জন করতে হয়। জ্ঞানের কোন সীমারেখা নেই। শিক্ষক যতবেশি জ্ঞানী হবেন,

কথায় ও কাজে তাঁর নিকট থেকে স্বাভাবিক ভাবেই শিক্ষার্থীর ততবেশি জ্ঞান সঞ্চার হয়। কখনও তাঁর জ্ঞাতসারে কখনও অজ্ঞাতসারে জ্ঞান চর্চায় ডুবে থাকাই তাঁর এ পেশাগত কাজ।

একজন শিক্ষককে নিম্নলিখিত বিষয়ে জ্ঞান অর্জন করতে হয় ঃ

- তার বিষয়গত জ্ঞান (পঠিত ও পাঠদান বিষয়)
- শিক্ষার্থীকে জানবার জ্ঞান
- শিখন পরিবেশের জ্ঞান
- শিক্ষাদান সম্পর্কিত জ্ঞান
- বিদ্যালয় ও তার সংশ্লিষ্ট প্রশাসনিক জ্ঞান
- তত্ত্বাবধান সংক্রান্ত জ্ঞান
- অন্যান্য বিষয় সংক্রান্ত মৌলিক ধারণা
- তাঁর রুচি ও আগ্রহ অনুযায়ী অন্য যে কোন বিষয়ের জ্ঞান।

খ) শিক্ষকের দক্ষতার উন্নয়ন

শিক্ষাদান কাজ একটি কৌশলগত কাজ। অতএব এ ব্যাপারে শিক্ষক যত বেশি দক্ষ হবেন তাঁর দ্বারা তত ভাল সেবা পাওয়া যাবে। অতএব শিখন শেখানো কার্যক্রমের সঙ্গে সংশ্লিষ্ট বিষয়ে তাঁকে দক্ষতা অর্জন করতে হবে, দক্ষতা বৃদ্ধি করতে হবে। জ্ঞান সীমাহীন আর এ সীমাহীন জ্ঞান দান করার দক্ষতারও শেষ নেই। বিশ্বে জ্ঞান চর্চার পাশাপাশি শিক্ষাক্রমের উন্নয়ন ধারা গতিশীল, এর সঙ্গে শিক্ষাদানের কলাকৌশলও গতিশীল। অতএব শিক্ষকের দক্ষতা উন্নয়নের জন্য নিম্ন বিষয়াবলি সম্বন্ধে সর্বাধুনিক খোঁজ খবর রাখতে হবে এবং গবেষণা করতে হবে, প্রয়োজনীয় ব্যবস্থা অবলম্বন ও বাস্তবায়ন করতে হবে।

- শিখন পরিবেশ সৃষ্টি
- শ্রেণি ব্যবস্থাপনা সংগঠন
- পাঠ উপস্থাপন
- শিক্ষার্থীদের শিখনে উদ্বুদ্ধকরণ
- শিক্ষার্থীদের পাঠে সক্রিয় ভূমিকায় অবতীর্ণ করানো
- সমস্যা উদঘাটন / চিহ্নিত করণ
- সমস্যা সমাধানের কৌশল অবলম্বন
- উপকরণ নির্বাচন ও উদ্ভাবন
- শিক্ষার্থীদের পরিচালনা ও নির্দেশনা দান
- তত্ত্বাবধান কৌশল ও প্রয়োগ
- শিক্ষার্থীর আস্থা অর্জন

- শিক্ষার্থীর আত্মবিশ্বাস সৃষ্টি
- উদ্দেশ্য অনুযায়ী পাঠ পরিকল্পনা
- পাঠকে ফলপ্রসূকরণ
- মূল্যায়ন কৌশল ও
- মূল্যায়ন করণ।

গ) শিক্ষকতা কাজের উন্নয়ন

শিক্ষক হিসেবে বিদ্যালয়ে শিক্ষকের বহুবিধ কাজ সম্পন্ন করতে হয়। যদিও শিক্ষাদান কার্য তার মুখ্য কাজ এর পাশাপাশি সহ-পাঠক্রমিক কার্যাবলি পরিচালনাও তার কাজ। এতদব্যতীত বিদ্যালয় পরিচালনার প্রশাসনিক ও ব্যবস্থাপনা সংক্রান্ত কার্যাবলিতে সহযোগিতা করাও তার কাজ। এ সব কার্যাবলি সুষ্ঠুভাবে পরিচালনার জন্য উন্নয়ন ও অভিজ্ঞতা সমৃদ্ধ হওয়াও তাঁর পেশাগত উন্নয়ন। শিক্ষকের কার্যাবলি নিম্নরূপ :

(১) শিক্ষাক্রমিক -

শ্রেণি পাঠদান , তত্ত্বাবধান, মূল্যায়ন।

(২) সহ-শিক্ষাক্রমিক (সমাজ, শিক্ষা ও সাহিত্য বিষয়ক কার্যাবলি)-

- পরিষ্কার-পরিচ্ছন্নতা, শিল্প, সংস্কৃতি এবং রুচিবোধকে মূল্য দিয়ে শ্রেণিকক্ষ, শিক্ষা প্রতিষ্ঠান এবং শিক্ষাঙ্গন পরিচালনা করা। প্রতিদিন শ্রেণিকক্ষ পরিষ্কার করা ও সাজান যা শিক্ষার্থীরা নিজেরা করার চেষ্টা করবে;
- স্বাস্থ্য, খাদ্য ও পুষ্টি সম্পর্কিত আলোচনার ব্যবস্থা রাখা;
- শিক্ষা প্রতিষ্ঠানে নিয়ম-শৃঙ্খলা রক্ষার জন্য কর্তৃপক্ষের সঙ্গে সহযোগিতা করা;
- সাহিত্য বিষয়ক সেমিনার, আলোচনা সভা, বক্তৃতা, বিতর্ক ইত্যাদির ব্যবস্থা করা;
- নানা ধরনের লিখিত প্রকাশনার ব্যবস্থা করা। বুলেটিন বোর্ড, দেয়াল পত্রিকা, রচনা প্রতিযোগিতা, জার্নাল ও ম্যাগাজিন প্রকাশনা এ ধরনের কার্যাবলির অংশ হতে পারে;
- শিক্ষামূলক ভ্রমণ এবং এ সম্পর্কিত রচনা প্রকাশ;
- এ সকল কর্মকাণ্ডে সচেতন এবং উৎসাহী অভিভাবকবৃন্দকে অংশগ্রহণের আমন্ত্রণ জানানো যেতে পারে।

বিনোদনমূলক কার্যাবলি

- বিভিন্ন জাতীয় দিবস উদযাপন, মনীষীদের জন্ম ও মৃত্যু দিবস, পুরস্কার বিতরণী, বিচিত্রা অনুষ্ঠান
- বনভোজন, বার্ষিক ভোজ
- ঈদে মিলাদ-উন-নবী, মহররম, পূজা, পার্বণ
- ভিডিও ক্লাব, ছবি তোলা
- নাটক মঞ্চস্থ করা
- নাচ, গান, চিত্র অঙ্কন, মডেল তৈরি ইত্যাদি

খেলাধুলা ও দৈহিক অনুশীলনমূলক কার্যাবলি

- সকল প্রকার বহিঃস্থ মাঠে খেলাধুলা, ফুটবল, ভলিবল, বাস্কেট বল, ক্রিকেট, হাডু-ডু ইত্যাদি।
- জিমন্যাসিয়ামে শরীর চর্চা
- অভ্যন্তরীণ খেলাধুলা- ক্যারাম, চেস, তাস
- সাঁতার এবং মুক্তাঙ্গনে ব্যায়াম
- ক্লাব, স্কাউট, গার্লগাইড, রেডক্রস, ন্যাশনাল ক্যাডেট কোর ইত্যাদি

বিজ্ঞান বিষয়ক কার্যাবলি

ইলেকট্রনিক্স; রেডিও, টিভি মেরামত; ক্যালকুলেটর, কম্পিউটার, শিক্ষা; ছবি তোলা ও প্রসেসিং করা; ইন্টারনেট; বাংলাদেশের উপযোগী বিভিন্ন ধরনের যন্ত্রপাতি তৈরির পরিকল্পনা করা ইত্যাদি।

সমাজসেবামূলক কার্যাবলি

- সমাজ কল্যাণ সমিতি, দরিদ্র শিক্ষার্থীদের ঋণদান, অনগ্রসর শিক্ষার্থীদের টিউটোরিয়াল সেবা, অসুস্থ শিক্ষার্থী কর্মচারীদের সেবা ও পরামর্শ প্রদান
- নিরক্ষরতা দূরীকরণ
- বই ঋণদান কর্মসূচি, হারানো ও প্রাপ্তি সেবা

পৌর প্রশিক্ষণমূলক কার্যাবলি

- ছাত্র সংসদ, বিভিন্ন কমিটি, উপ-কমিটি গঠন
- অনুকরণমূলক সংসদ পরিচালনা

(৩) ব্যবস্থাপনা ও প্রশাসনিক

- ভর্তি পরীক্ষা ও ভর্তি কার্যক্রম

- পরীক্ষাসমূহ পরিচালনা
- স্থানীয় জনগোষ্ঠীর সঙ্গে যোগাযোগ
- বিভিন্ন তথ্য সংগ্রহ ও সংরক্ষণে সহায়তা করা
- আন্তবিদ্যালয় কর্মকাণ্ডে অংশগ্রহণের কার্যাবলিতে সক্রিয় সহায়তা দান।

অন্যান্য ; স্থানীয় সরকার ও ঊর্ধ্বতন কর্তৃপক্ষের যে কোন অনুরোধ ও আদেশ পালন।

(ঘ) শিক্ষকতা মনোবৃত্তির উন্নয়ন

শিক্ষকতা একটি মহৎ পেশা। কচি কাচা শিশু ও শিক্ষার্থীদের নিয়ে তাঁর কাজ। তাদের সঙ্গে তাদের একজন আপন বন্ধু হিসেবে শিক্ষককে মিলে চলতে হয়। তাদের হাসি, আনন্দ, সুখ ও দুঃখের সাথী তিনি। ভালবাসা দিয়ে তাদেরকে লালন করতে হয় শিক্ষককে। একটু একটু করে তাদের জ্ঞান, দক্ষতা, আচার আচরণ, বিশ্বাস, মূল্যবোধ, দৃষ্টিভঙ্গি, বুদ্ধি, ব্যক্তিত্ব ইত্যাদির বিকাশ ঘটাতে হয় শিক্ষককে। শিক্ষককে সেজন্য এ কাজে সর্বদা নিবেদিত প্রাণে নিয়োজিত থাকতে হয়। শিক্ষককে হতে হয় ধৈর্যশীল, কষ্ট সহিষ্ণু, ত্যাগী ও পরিশ্রমী। অর্থ দিয়ে শিক্ষকের কাজের কখনও মূল্যায়ন করা যায় না, এ দৃষ্টিভঙ্গি তাঁর এবং সকলের থাকতে হবে। শিক্ষককে সেজন্য শিক্ষকসুলভ মনোবৃত্তি অর্জন ও উন্নয়ন করতে হবে। ব্যক্তি বৈষম্য থাকা স্বাভাবিক, একই প্রতিষ্ঠানের সকল শিক্ষকের মনোবৃত্তির মধ্যে সমন্বয় সাধনের চেষ্টা করতে হবে, পারস্পরিক শ্রদ্ধাবোধ ও মতামত প্রদর্শনে সহনশীল হতে হবে। আন্তরিক হতে হবে শিক্ষক-শিক্ষক, শিক্ষক-কর্মচারী, শিক্ষক-শিক্ষার্থী, শিক্ষক-অভিভাবক পরস্পরের সম্পর্কের ক্ষেত্রে গবেষণা লব্ধ ফলাফলে লক্ষ করা যায় শিক্ষাক্রম, শিক্ষাদান পদ্ধতি ও কৌশল, সমাজ ও সংস্কৃতির পরিবর্তনের সঙ্গে শিক্ষকের দৃষ্টিভঙ্গির উন্নয়ন প্রয়োজন।

উন্নয়ন কৌশল

পেশাগত উন্নয়নের উপায় ও কৌশল : শিক্ষকের পেশাগত উন্নয়ন বলতে তাঁর পেশা সংশ্লিষ্ট বিষয়াবলি ও কার্যাবলির উন্নয়নকে বুঝায়। এ উন্নয়ন ধারাবাহিক ও প্রবাহমান। অতএব ধারাবাহিক ও প্রবাহমান জ্ঞান চর্চা ও প্রশিক্ষণের মাধ্যমেই এ উন্নয়ন সম্ভব। পেশাগত উন্নয়নের জন্য পেশাগত প্রশিক্ষণের বিকল্প নেই।

এ উন্নয়নের জন্য নীতি নির্ধারক প্রশাসক ও ব্যবস্থাপনার যেমন দায়িত্ব রয়েছে শিক্ষকের নিজেরও দায়িত্ব রয়েছে। শিক্ষককে এ ব্যাপারে সচেতন হতে হবে। যে সমস্ত ক্রিয়া কৌশল ও প্রক্রিয়ার মাধ্যমে এ উন্নয়ন ঘটানো যায় সেগুলো নিম্নরূপ:

- শিক্ষক প্রশিক্ষণ - দীর্ঘমেয়াদী, স্বল্প মেয়াদী ও অন্যান্য
- আন্তবিদ্যালয় প্রশিক্ষণ কর্মসূচি

- অন্তবিদ্যালয় প্রশিক্ষণ
- কেস স্টাডি
- তাৎক্ষণিক গবেষণা
- বিষয় ভিত্তিক প্রশিক্ষণ
- শিক্ষা বিষয়ক পত্র পত্রিকা পাঠ (দেশি ও বিদেশি)
- শিক্ষা বিভাগীয় বিভিন্ন নির্দেশনা অনুধাবন
- অণুঃশিক্ষণ
- সেমিনার, সিম্পোজিয়াম
- বিদেশে প্রশিক্ষণ / ভ্রমণ (স্টাডি ট্যুর)
- পুস্তক পাঠ।

দীর্ঘমেয়াদী প্রশিক্ষণ

শিক্ষকদের পেশাগত উন্নয়নের জন্য দীর্ঘ মেয়াদী প্রশিক্ষণ হল- বিএড যার মেয়াদ এক বৎসর এবং এমএড যার মেয়াদ ১০ মাস। এই ধরনের প্রশিক্ষণ টিচার্স ট্রেনিং কলেজগুলোতে দেয়া হয়। তবে এর পাশাপাশি বাংলাদেশ উন্মুক্ত বিশ্ববিদ্যালয়ের দূর শিক্ষণে বিএড কোর্সের মেয়াদ এক বছর এবং এমএড কোর্সের মেয়াদ দেড় বছর। বর্তমানে সরকারি টিচার্স ট্রেনিং কলেজের পাশাপাশি জাতীয় বিশ্ববিদ্যালয়ের অনুমতি প্রাপ্ত অনেক বেসরকারি কলেজেও বিএড কোর্স করান হয়। এ ছাড়া বেশ কিছু প্রাইভেট বিশ্ববিদ্যালয়েও বিএড কোর্স রয়েছে।

স্বল্পমেয়াদী প্রশিক্ষণ

পেশাগত উন্নয়নের জন্য শিক্ষকদের স্বল্পমোদী কোর্স অত্যন্ত কার্যকর। এক সময়ে মাধ্যমিক শিক্ষা ও বিজ্ঞান উন্নয়ন কেন্দ্রগুলোতে (NSESDC I SESDC) ৬টি বিষয়ে স্বল্পমেয়াদী (১৪ দিন ও ২১ দিন) প্রশিক্ষণ দেয়া হত। বিষয়গুলো হল ঃ বাংলা, ইংরেজি, গণিত, সামাজিক বিজ্ঞান, জড় বিজ্ঞান ও জীব বিজ্ঞান। পরবর্তীতে FASSAP-(Female Secondary School Assistance Project-II) ২০০৩ সাল থেকে স্বল্পমেয়াদী প্রশিক্ষণের আয়োজন করে যা সঞ্জীবনী কোর্স (Refresher Course) নামে খ্যাত। এখানে প্রধান শিক্ষকসহ সহকারী প্রধান শিক্ষকদের জন্যও প্রশিক্ষণের ব্যবস্থা করা হয়েছে। এছাড়া ELTIP (English Language Teaching Improvement Project) থেকে শুধু ইংরেজি শিক্ষকদের প্রশিক্ষণ দেয়া হচ্ছে।

বর্তমানে TQI-SEP (Teaching Quality Improvement in Secondary Education Project) থেকেও বিষয় শিক্ষকদের বিষয়ভিত্তিক ১৪ দিনের CPD (Continuous Professional

Development) ও ৫ দিনের সঞ্জীবনী প্রশিক্ষণ দেয়া হচ্ছে। এছাড়া TQI-SEP সকল মাধ্যমিক বিদ্যালয়ের প্রধান শিক্ষকদের জন্য ২১ দিনের প্রশাসনিক ও ব্যবস্থাপনা বিষয়ক প্রশিক্ষণ কোর্স আয়োজন করেছে। SESIP (Secondary Education Sector Improvement Project) মাধ্যমিক বিদ্যালয়ের শিক্ষকদেরকে সৃজনশীল প্রশ্ন প্রণয়নের ওপর প্রশিক্ষণ দিচ্ছে।

অন্যান্য প্রশিক্ষণ

দীর্ঘমেয়াদী এবং স্বল্পমেয়াদী প্রশিক্ষণ ছাড়াও NAEM (National Academy for Educational Management) প্রধান শিক্ষক ও মাদ্রাসার সুপারদের জন্য প্রশিক্ষণের ব্যবস্থা করে থাকে। NCTB (National Curriculum and Text Book Board) জনসংখ্যা, বিদ্যালয় ভিত্তিক মূল্যায়ন (SBA) ও শিক্ষাক্রম বিস্তরণের উপর স্বল্পমেয়াদী (১/২/৩ দিন) প্রশিক্ষণের ব্যবস্থা করে থাকে।

কোন শিক্ষক কোন প্রশিক্ষণ কোর্সে যোগদান করলে বিদ্যালয়ে আসার ৭ (সাত) দিনের মধ্যে ঐ কোর্স সম্পর্কে সবাইকে আইনানুগভাবে অবহিত করবেন। এ ব্যাপারে প্রধান শিক্ষক মুখ্য ভূমিকা পালন করবেন।

এছাড়া শিক্ষা সংশ্লিষ্ট গুরুত্বপূর্ণ বিষয় চিহ্নিত করে তা আলোচনার দায়িত্ব বিভিন্ন শিক্ষককে দেয়া যায়। দায়িত্বপ্রাপ্ত শিক্ষক নির্দিষ্ট দিনে তাঁর বিষয়বস্তুর উপর জ্ঞানগর্ভ আলোচনা করবেন। এভাবে জ্ঞানের পরিধি আরও বেড়ে যাবে। বিশ্ব এগিয়ে যাচ্ছে প্রতিনিয়ত। এই উন্নয়নের সাথে তাল মেলাতে হলে উন্নত জ্ঞান, দক্ষতা ও কৌশল আয়ত্ত্ব করতে হয়। তাই শিক্ষকদের প্রশিক্ষণের মাধ্যমে পরিবর্তিত পরিস্থিতির সঙ্গে নতুনভাবে চিন্তা করার ও খাপ খাওয়ানোর প্রস্তুতি নিতে হবে।

মূল্যায়ন

১. পেশা কী? পেশা ও চাকুরির মধ্যে পার্থক্যসমূহ লিখুন।

২. শিক্ষকের পেশাগত উন্নয়ন বলতে কী বুঝায় - ব্যাখ্যা করুন।

৩. শিক্ষকের পেশাগত উন্নয়নের উপায় ও কৌশল সম্পর্কে লিখুন।

৪. শিক্ষকতা মনোবৃত্তির উন্নয়ন কেন প্রয়োজন?

৫. আপনার বিদ্যালয়ের শিক্ষকদের পেশাগত উন্নয়নের ৩টি ক্ষেত্র চিহ্নিতপূর্বক উন্নয়নের একটি পরিকল্পনা তৈরি করুন।

সম্ভাব্য উত্তর

পর্ব-ক

আপনি নিজে উত্তর প্রস্তুত করুন। উত্তরটি আপনার সতীর্থকে দেখান এবং আলোচনা করে আরও উন্নত করুন। প্রয়োজনে টিউটরের সহায়তা নিন।

পর্ব-খ

শিক্ষকের পেশাগত দক্ষতা:

- শিখন পরিবেশ সৃষ্টি
- শ্রেণি ব্যবস্থাপনা সংগঠন
- পাঠ উপস্থাপন
- শিক্ষার্থীদের শিখনে উদ্বুদ্ধকরণ
- শিক্ষার্থীদের পাঠে সক্রিয় ভূমিকায় অবতীর্ণ করানো
- সমস্যা উদঘাটন / চিহ্নিতকরণ
- সমস্যা সমাধানের কৌশল অবলম্বন
- উপকরণ নির্বাচন ও উদ্ভাবন
- শিক্ষার্থীদের পরিচালনা ও নির্দেশনা দান
- তত্ত্বাবধান কৌশল ও প্রয়োগ
- শিক্ষার্থীর আস্থা অর্জন
- শিক্ষার্থীর আত্মবিশ্বাস সৃষ্টি
- উদ্দেশ্য অনুযায়ী পাঠ পরিকল্পনা
- পাঠকে ফলপ্রসূকরণ
- মূল্যায়ন কৌশল ও
- মূল্যায়নকরণ।

পর্ব-গ

শিক্ষকের পেশাগত উন্নয়নের সম্ভাব্য উপায়:

- শিক্ষক প্রশিক্ষণ - দীর্ঘমেয়াদী, স্বল্প মেয়াদী ও অন্যান্য
- আন্তঃবিদ্যালয় প্রশিক্ষণ কর্মসূচি
- আন্তঃবিদ্যালয় প্রশিক্ষণ
- কেস স্টাডি
- তাৎক্ষণিক গবেষণা
- বিষয় ভিত্তিক প্রশিক্ষণ
- শিক্ষা বিষয়ক পত্র পত্রিকা পাঠ (দেশি ও বিদেশি)
- শিক্ষা বিভাগীয় বিভিন্ন নির্দেশনা অনুধাবন
- অণুশিক্ষণ
- সেমিনার, সিম্পোজিয়াম
- বিদেশে প্রশিক্ষণ / ভ্রমণ (স্টাডি ট্যুর)
- পুস্তক পাঠ।

ইউনিট -১০ **অধিবেশন-৪**

পরীক্ষা

ভূমিকা

'পরীক্ষা' আমাদের নৈন্দিন জীবনে অত্যন্ত পরিচিত শব্দ। জীবনের বিভিন্ন ক্ষেত্রে আমাদের প্রতিনিয়ত পরীক্ষার মুখোমুখি হতে হয়। শিক্ষাক্ষেত্রে শব্দটি বিশেষ অর্থে ব্যবহৃত হয়। আমরা এ অধিবেশনে এ সম্পর্কে বিস্তারিত আলোচনা করবো।

উদ্দেশ্য

এ অধিবেশন শেষে আপনি–

- পরীক্ষা ও পরীক্ষার প্রকারভেদ বর্ণনা করতে পারবেন।
- বাংলাদেশে প্রচলিত পরীক্ষা পদ্ধতির ত্রুটিসমূহ চিহ্নিত করতে পারবেন।
- প্রচলিত পরীক্ষা পদ্ধতির ত্রুটিসমূহ দূরীকরণের উপায় বর্ণনা করতে পারবেন।

পর্বসমূহ

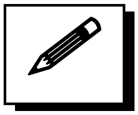

পর্ব-ক : পরীক্ষা ও পরীক্ষার প্রকারভেদ

শিক্ষার্থীদের শিক্ষাগত উন্নতির মান বা মূল্য নিরূপণ যে কোন শিক্ষা ব্যবস্থার একটি অবিচ্ছিন্ন অংশ। শিক্ষার বিভিন্ন স্তরের জন্য পূর্ব নির্ধারিত উদ্দেশ্যাবলির সঙ্গে বিভিন্ন স্তরের অধ্যয়নরত শিক্ষার্থীর পাঠ্যাবস্থা এবং তার ফলাফল কতটা সামঞ্জস্যপূর্ণ হচ্ছে উন্নতমানের পরীক্ষা ব্যবস্থা ও পদ্ধতির মাধ্যমে তা বহুলাংশে নিরূপণ করা সম্ভব। তাছাড়া শ্রেণিকক্ষে একজন শিক্ষক কতখানি পাঠদানে সমর্থ হয়েছেন, তিনি যা যা পড়াতে চেয়েছেন তা অর্জিত হয়েছে কিনা, তিনি পাঠদান ফলপ্রসূ করার জন্য যে শিক্ষণ উপকরণ ব্যবহার করেছেন, যে পদ্ধতি অনুসরণ করেছেন, তাতে তিনি সফলকাম হয়েছেন কিনা তার উত্তরও পাওয়া যাবে পরীক্ষার মাধ্যমে। যে প্রক্রিয়ায় কোন একটি বিষয়ে একজন শিক্ষার্থীর সামর্থ্য, নৈপুণ্য, অর্জিত জ্ঞান অথবা সাফল্য যাচাই করা হয় তাকে পরীক্ষা বলে। মূল্যায়নের ক্ষেত্রে পরীক্ষার ভূমিকা খুবই গুরুত্বপূর্ণ। এটি শিক্ষা ও বুদ্ধি নির্বাচনের এবং বিদ্যালয় ও শিক্ষকের কর্মকাণ্ডের সাফল্যের পরিমাপক। শিক্ষণ কাজের সাথে পরীক্ষা অঙ্গাঅঙ্গিভাবে জড়িত। শিখন-শেখানো কর্মকাণ্ডের কার্যকারিতা যাচাই করার প্রচলিত কৌশল হল পরীক্ষা। পরীক্ষা শিক্ষার্থীকে বিষয়বস্তু আয়ত্ত করতে অনুপ্রাণিত করে। পরীক্ষা আছে বলেই শিক্ষার্থী প্রস্তুতি গ্রহণের জন্য অনুপ্রাণিত হয়। তাই পরীক্ষা প্রেরণা হিসাবে কাজ করে।

পরীক্ষার প্রকার ভেদ

বর্তমানে ব্যবহৃত পরীক্ষা পদ্ধতি নিম্নরূপ :

ক) লিখিত পরীক্ষা

খ) মৌখিক পরীক্ষা

লিখিত পরীক্ষার শ্রেণিবিভাগ :

ক) অনিয়মতান্ত্রিক বা ঘরোয়া পরীক্ষা

খ) নিয়মতান্ত্রিক বা আদর্শায়িত পরীক্ষা

ক) অনিয়মতান্ত্রিক বা ঘরোয়া পরীক্ষা দুই ধরনের

১। রচনামূলক

২। নৈর্ব্যক্তিক

তাহলে এবার আসুন প্রশ্নের ধরনের উপর ভিত্তি করে পরীক্ষাকে যে কত ভাগে ভাগ করা যায় তা নিম্নের ছকে লেখার চেষ্টা করি -

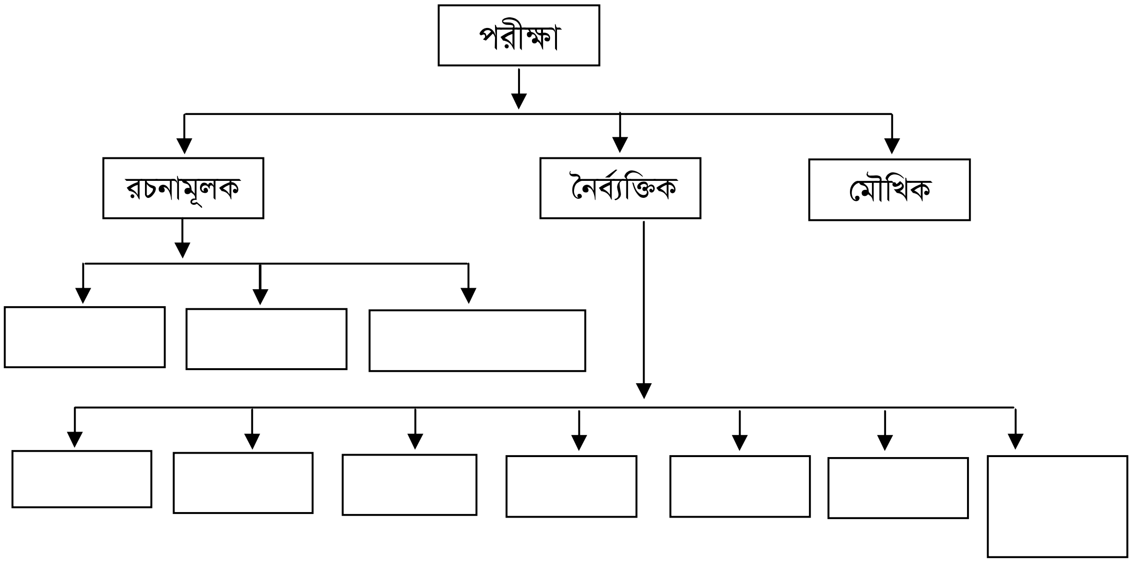

পর্ব-খ : প্রচলিত পরীক্ষা পদ্ধতির ত্রুটি

বর্তমানে বাংলাদেশে প্রচলিত পরীক্ষা পদ্ধতির অনেক ত্রুটি রয়েছে। এ ত্রুটিসমূহকে নিম্নোক্তভাবে ভাগ করা যায় -

(ক) একাডেমিক ত্রুটি

(খ) প্রশ্ন প্রণয়নে ত্রুটি

(গ) পরীক্ষা গ্রহণে ত্রুটি

(ঘ) উত্তরপত্র মূল্যায়নে ত্রুটি

(ঙ) পরীক্ষা সংক্রান্ত গোপনীয়তা ত্রুটি

(চ) পরীক্ষার ফল প্রকাশে ত্রুটি

শিক্ষার্থী বন্ধুরা, এবার আমরা উপরোক্ত ত্রুটিসমূহকে নিম্নের ছকে সাজানোর চেষ্টা করি-

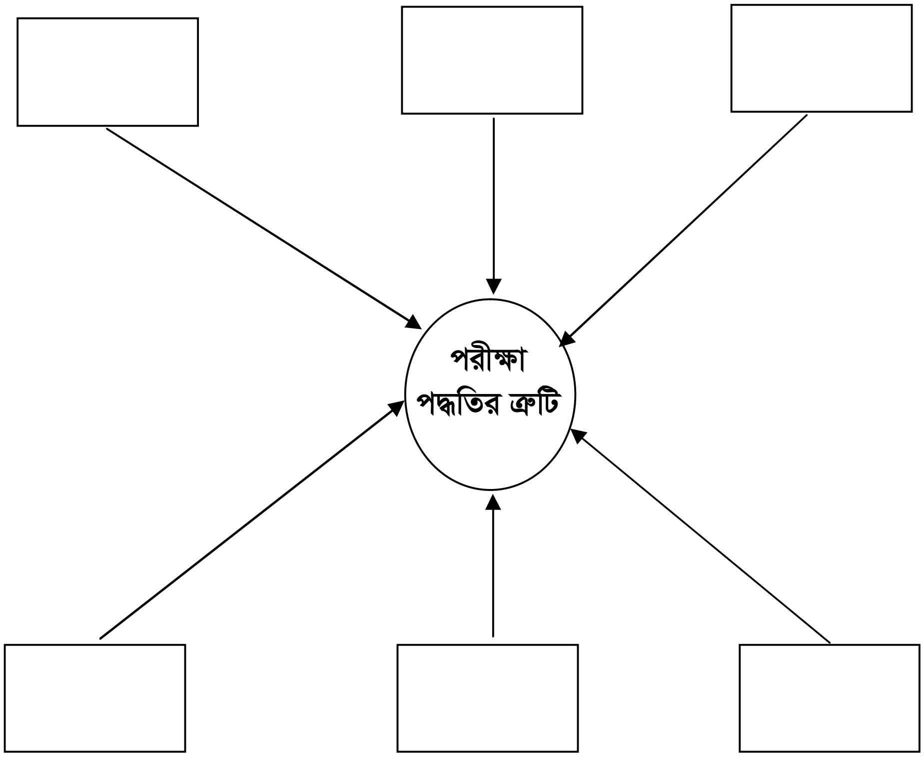

পর্ব-গ : প্রচলিত পরীক্ষা পদ্ধতির ত্রুটি দূরীকরণের উপায়সমূহ

বাংলাদেশে গতানুগতিক পরীক্ষা পদ্ধতির ত্রুটিসমূহ দূর করার উপায়সমূহ :

১। শ্রেণিকক্ষে পাঠদানের মান উন্নত করা।

২। প্রশ্ন প্রণেতাদের পেশাগত প্রশিক্ষণের ব্যবস্থা করা

৩। প্রশ্ন প্রণয়নে যথেষ্ট সময় দেয়া

৪। শ্রেণি শিক্ষকদের প্রশ্ন প্রণেতা হিসাবে নির্বাচন করা

৫। প্রশ্ন মডারেটর নিয়োগে বিষয় ভিত্তিক মডারেটরকে গুরুত্ব প্রদান

৬। মাধ্যমিক স্তরের শিক্ষকদের পেশাগত প্রশিক্ষণ (বি.এড. ও এম. এড) বাধ্যতামূলক করা, তাছাড়া বিষয় শিক্ষক বিশেষ করে বিজ্ঞান ও গণিত বিষয়ের শিক্ষকদের চাকরিকালিন প্রশিক্ষণের ব্যবস্থা করা।

৭। শিক্ষার্থীদের আসন ব্যবস্থা নিশ্চিত করা

৮। পরীক্ষায় অসদুপায় অবলম্বনের বিরুদ্ধে প্রতিরোধ গড়ে তোলা

৯। পরীক্ষার কক্ষ পরিদর্শকদের প্রশিক্ষণের ব্যবস্থা করা।

১০। প্রশ্নে তিন ধরনের প্রশ্ন (রচনামূলক, সংক্ষিপ্ত উত্তর ও নৈর্ব্যক্তিক) থাকা প্রয়োজন। রচনামূলক ও সংক্ষিপ্ত প্রশ্নের জন্য ৫০ নম্বর এবং নৈর্ব্যক্তিক প্রশ্নের জন্য ৫০ নম্বর থাকবে।

১১। প্রশ্ন প্রণয়নকারীদের বোর্ড কর্তৃক উপযুক্ত সম্মানী দেয়া।

১২। উত্তরপত্র মূল্যায়নের জন্য পরীক্ষকদের পর্যাপ্ত সময় দেয়া।

১৩। একই উত্তরপত্র একাধিক পরীক্ষক দ্বারা মূল্যায়নের ব্যবস্থা করা।

১৪। কম্পিউটারের সাহায্যে নৈর্ব্যক্তিক অংশের স্কোরিং করা যেতে পারে (বর্তমানে চালু করা হয়েছে)।

১৫। পরীক্ষার প্রশ্নপত্র যাতে ফাস না হয় সে ব্যাপারে বিশেষ ব্যবস্থা রাখা দরকার।

১৬। চিন্তার উদ্রেকমূলক ও সৃজনশীলতার সহায়ক প্রশ্ন পরীক্ষায় অন্তর্ভুক্ত করা।

১৭। কেবলমাত্র সাময়িক বা বার্ষিক পরীক্ষা নয়, শিক্ষার্থীর সর্বাত্মক পরিচয়পত্র (Commulative Record) সংরক্ষণসহ আরও অন্যান্য কৌশল গ্রহণের ব্যবস্থা করা।

১৮। নম্বর প্রদানের সাধারণ নীতিমালা তৈরি করে উত্তরপত্র পরীক্ষণের সাথে সরবরাহ করা। প্রয়োজনে নমুনা উত্তর তৈরি করে সরবরাহ করা।

১৯। পরীক্ষাকে শিক্ষার্থীর সার্বিক অগ্রগতি মূল্যায়নের মাধ্যম হিসেবে দেখা।

২০। লিখিত পরীক্ষার পাশাপাশি মৌখিক পরীক্ষা চালু করা। এতে করে বুদ্ধিমত্তা, আগ্রহ, মানসিক, দৃষ্টিভঙ্গি, ব্যক্তিগত বৈশিষ্ট্য ইত্যাদি পরিমাপ করা যাবে।

২১। কেবল শিখন অগ্রগতির পরিমাপই নয়, দুর্বল শিক্ষার্থীদের জন্য প্রয়োজনীয় নিরাময়মূলক ব্যবস্থা গ্রহণ করা।

২২। পুরো বই বা বিষয়বস্তু থেকে প্রশ্ন করা।

২৩। মাঝে মাঝে বিষয় শিক্ষকদের জন্য বিদ্যালয় ভিত্তিক স্টাফ ডেভেলপমেন্টের উদ্যোগ গ্রহণ করে এ সম্পর্কে প্রশিক্ষণের ব্যবস্থা করা।

ইউনিট-১০ **অধিবেশন-৪**

মূল শিখনীয় বিষয়

পরীক্ষা

শিক্ষার্থীদের শিক্ষাগত উন্নতির মান বা মূল্য নিরূপণ যে কোন শিক্ষা ব্যবস্থার একটি অবিচ্ছিন্ন অংশ। শিক্ষার বিভিন্ন স্তরের জন্য পূর্ব নির্ধারিত উদ্দেশ্যাবলির সঙ্গে সমস্ত স্তরের অধ্যয়নরত শিক্ষার্থীর পাঠ্যাবস্থা এবং তার ফলাফল কতটা সামঞ্জস্যপূর্ণ হচ্ছে উন্নতমানের পরীক্ষা ব্যবস্থা ও পদ্ধতির মাধ্যমে তা বহুলাংশে নিরূপণ করা সম্ভব। তাছাড়া শ্রেণিকক্ষে একজন শিক্ষক কতখানি পাঠদানে সমর্থ হয়েছেন, তিনি যা যা পড়াতে চেয়েছেন তা অর্জিত হয়েছে কিনা, তিনি পাঠদান ফলপ্রসূ করার জন্য যে শিক্ষণ উপকরণ ব্যবহার করেছেন, যে পদ্ধতি অনুসরণ করেছেন, তাতে তিনি সফলকাম হয়েছেন কিনা তার উত্তরও পাওয়া যাবে পরীক্ষার মাধ্যমে।

যে প্রক্রিয়ায় কোন একটি বিষয়ে একজন শিক্ষার্থীর সামর্থ্য, নৈপুণ্য, অর্জিত জ্ঞান অথবা সাফল্য যাচাই করা হয় তাকে পরীক্ষা বলে। মূল্যায়নের ক্ষেত্রে পরীক্ষার ভূমিকা খুবই গুরুত্বপূর্ণ। এটি শিক্ষা ও বুদ্ধি নির্বাচনের এবং বিদ্যালয় ও শিক্ষকের কর্মকাণ্ডের সাফল্যের পরিমাপক। শিক্ষণ কাজের সাথে পরীক্ষা অঙ্গাঅঙ্গিভাবে জড়িত। শিখন-শেখানো কর্মকাণ্ডের কার্যকারিতা যাচাই করার প্রচলিত কৌশল হল পরীক্ষা। পরীক্ষা শিক্ষার্থীকে বিষয়বস্তু আয়ত্ত করতে অনুপ্রাণিত করে। পরীক্ষা আছে বলেই শিক্ষার্থী প্রস্তুতি গ্রহণের জন্য অনুপ্রাণিত হয়। তাই পরীক্ষা প্রেরণা হিসাবে কাজ করে।

জাতীয় পরীক্ষা সংস্কার কমিটির সুপারিশ (১৯৭০) মতে উত্তম পরীক্ষা শিক্ষার্থীকে উন্নততর প্রণালিতে অধ্যয়নের অভ্যাস গড়ে তুলতে, অধিকতর উদ্যমে পড়াশুনা করতে উৎসাহিত করে এবং এ ব্যাপারে তাকে প্রেরণা যোগায়। বাংলাদেশ শিক্ষা কমিশন (১৯৭৪) প্রতিবেদনে বলা হয়েছিল আমাদের পরীক্ষা ব্যবস্থার প্রধান ত্রুটি হচ্ছে এই যে এতে বহিঃপরীক্ষার উপর অতিমাত্রায় গুরুত্ব দেয়া হয়। এতে বাড়ির কাজ, টিউটোরিয়াল, শ্রেণিকক্ষে সাময়িক পরীক্ষা, প্র্যাকটিক্যাল ও প্রয়োগমূলক ইত্যাদি কাজ ছাড়াও এই স্তরে প্রতি বছর অন্তত চারটি আন্তঃপরীক্ষা গ্রহণ করার কথা বলা হয়।

১৯৯৫ সালে পাঠ্যক্রম ও পাঠ্যসূচি উন্নয়ন কমিটি পরীক্ষা পদ্ধতি সম্পর্কে নিম্নোক্ত সুপারিশ প্রদান করে :

১। অন্তঃপরীক্ষা ও বহিঃপরীক্ষা চালু থাকবে

২। ধর্মীয়, নৈতিক, সাংস্কৃতিক ও সামাজিক মূল্যবোধ সৃষ্টির উপর মূল্যায়নের ব্যবস্থা থাকবে

৩। দেশাত্মবোধ ও মানবতাবোধের মূল্যায়ন করতে হবে

৪। জ্ঞানগত, আবেগিক ও মনোপেশীজ স্তরের মূল্যায়ন নিশ্চিত করতে হবে

৫। বর্তমানে প্রচলিত প্রক্রিয়া ও শিক্ষক কেন্দ্রিক পরীক্ষা ব্যবস্থার পুনর্গঠন করে পাঠকেন্দ্রিক, কর্মকেন্দ্রিক, শিক্ষার্থী কেন্দ্রিক পরীক্ষার ব্যবস্থা করতে হবে।

শিক্ষানীতি কমিটি (১৯৯৭)-এর আলোকে পরীক্ষা ও মূল্যায়ন পদ্ধতি : মাধ্যমিক পরীক্ষার ক্ষেত্রে অন্তঃপরীক্ষায় শতকরা ২০ ভাগ মূল্যায়নের ব্যবস্থা থাকবে। বহিঃপরীক্ষা ৮০% এর মধ্যে রচনামূলক ৩০%, সংক্ষিপ্ত উত্তর প্রশ্ন ৩০%, এবং নৈর্ব্যক্তিক ২০%, অন্তঃপরীক্ষা ও বহিঃপরীক্ষায় আলাদাভাবে পাশ করতে হবে। অন্তঃপরীক্ষার নম্বর বহিঃপরীক্ষার নম্বরের আনুপাতিক হার বা তার কাছাকাছি হতে হবে। অন্যথায় অন্তঃপরীক্ষায় কেবল পাশ নম্বর পাবে।

পরীক্ষার উদ্দেশ্য

পরীক্ষার উদ্দেশ্য

আমাদের দেশে শিক্ষা ব্যবস্থায় পরীক্ষার উদ্দেশ্য কী হওয়া উচিত সে সম্পর্কে বিভিন্ন শিক্ষা কমিশন (বাংলাদেশ শিক্ষা কমিশন রিপোর্ট-১৯৭৪, বাংলাদেশ জাতীয় শিক্ষা কমিশন রিপোর্ট-১৯৮৮, পরীক্ষা উন্নয়ন কমিটি রিপোর্ট-১৯৮৬ যে সব উদ্দেশ্য শনাক্ত করে তার সারসংক্ষেপ থেকে আমাদের দেশে পরীক্ষার নিম্নোক্ত উদ্দেশ্য পাওয়া যায়।

১. নির্ধারিত শিক্ষাক্রম অনুযায়ী শিক্ষার্থী কী পরিমাণ জ্ঞান ও দক্ষতা অর্জন এবং প্রয়োগ করতে সক্ষম হয়েছে তা নির্ধারণ;

২. শিক্ষার্থীর ভাবাবেগ, মানসিক বিকাশের গতিধারা, প্রবণতা, বুদ্ধিমত্তা, চরিত্র, ব্যক্তিত্ব, সৃজনশীলতা ও কর্মকুশল এবং দৃষ্টিভঙ্গি পরিবর্তনের মূল্যায়ন;

৩. উচ্চতর শিক্ষা প্রতিষ্ঠানে ভর্তির যোগ্যতা নির্ণয়;

৪. শিক্ষার্থীর জ্ঞান, ধারণা, দৃষ্টিভঙ্গি ও মূল্যবোধের ক্ষেত্রে লক্ষণীয় অসম্পূর্ণতা, অসম্পূর্ণতার কারণ নির্ণয় ও তা সংশোধনের ব্যবস্থা গ্রহণ;

৫. শিক্ষাদানের মান নির্ণয়, শিক্ষকের দায়িত্ব ও কর্তব্য সম্পর্কে সচেতন হতে সহায়তা করা এবং প্রয়োজনবোধে শিক্ষাদান পদ্ধতির পরিবর্তন ও পুনর্বিন্যাস করা;

৬. শিক্ষাক্রম, পাঠ্যসূচি ও পাঠ্যপুস্তকের ক্রমোন্নয়নে সহায়তা দান;

৭. শিক্ষার্থীর কৃতিত্বের মান নির্ধারণের সঙ্গে সঙ্গে শিক্ষা প্রতিষ্ঠানের মানও নির্ধারণ করা এবং দুর্বল শিক্ষার্থী ও নিম্নমানের প্রতিষ্ঠানগুলোকে উন্নত করার প্রচেষ্টা চালানো;

৮. সমগ্র দেশে বা একটি অঞ্চলের শিক্ষা প্রতিষ্ঠানের শিক্ষার্থীদের মানের সংগে তুলনামূলকভাবে একটি শিক্ষা প্রতিষ্ঠানের এবং শিক্ষার্থীর মান যাচাই করা;

৯. শিক্ষা মূল্যায়ন পদ্ধতির প্রতি জনগণের আগ্রহ ও আস্থা সৃষ্টি করা।

পরীক্ষার প্রকার ভেদ

বর্তমানে ব্যবহৃত পরীক্ষা পদ্ধতি নিম্নরূপ :

(ক) লিখিত পরীক্ষা

(খ) মৌখিক পরীক্ষা

লিখিত পরীক্ষার শ্রেণিবিভাগ :

(ক) অনিয়মতান্ত্রিক বা ঘরোয়া পরীক্ষা

(খ) নিয়মতান্ত্রিক বা আদর্শায়িত পরীক্ষা

(ক) অনিয়মতান্ত্রিক বা ঘরোয়া পরীক্ষা দুই ধরনের

১। রচনামূলক

২। নৈর্ব্যক্তিক

আমাদের দেশে শ্রেণিকক্ষে, এস.এস.সি, এইচ.এস.সি প্রভৃতি পরীক্ষা অনিয়মতান্ত্রিক পরীক্ষার অন্তর্গত কারণ এই সকল প্রশ্নপত্রের প্রশ্নকে কখনও আদর্শায়িত করা হয় না।

(ক) অন্যভাবে প্রশ্নের ধরনের উপর ভিত্তি করে পরীক্ষাকে নিম্নোক্তভাবে ভাগ করা যায়।

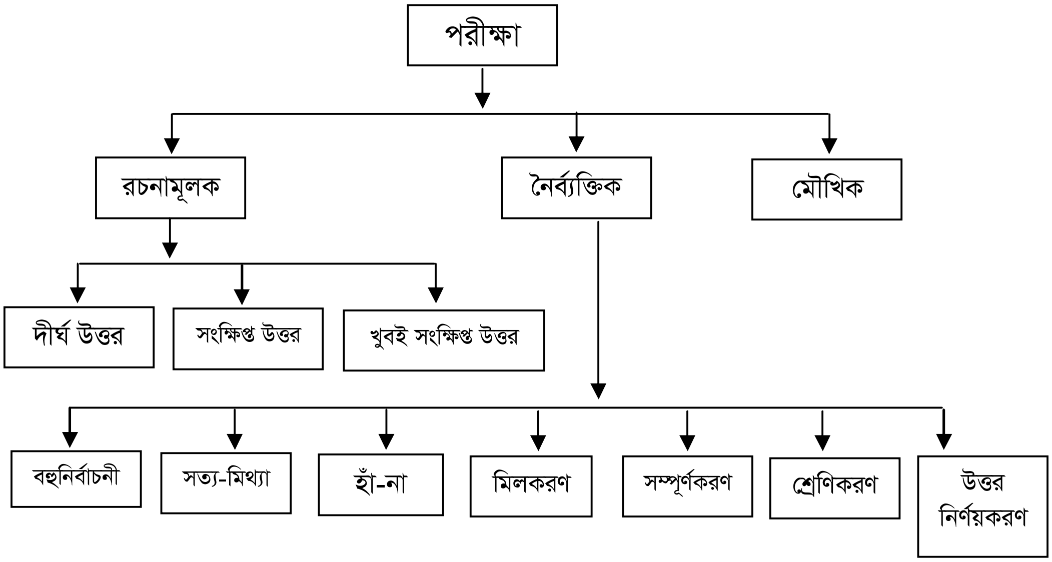

(খ) পরীক্ষা অনুষ্ঠিত হওয়ার সময়ের উপর ভিত্তি করে আমাদের মাধ্যমিক বিদ্যালয়ের পরীক্ষাগুলোকে আবার নিম্নোক্তভাবে ভাগ করা যায়।

- বার্ষিক পরীক্ষা
- অর্ধ-বার্ষিক পরীক্ষা
- টার্ম ফাইনাল পরীক্ষা

- দ্বি-মাসিক পরীক্ষা
- মাসিক পরীক্ষা
- সাপ্তাহিক পরীক্ষা
- টিউটোরিয়াল পরীক্ষা ইত্যাদি।

(গ) পরীক্ষা গ্রহণকারী কর্তৃপক্ষের উপর ভিত্তি করে মাধ্যমিক পর্যায়ের পরীক্ষাকে আবার তিনভাগে ভাগ করা যায়।

১) বিদ্যালয়ের অভ্যন্তরীণ পরীক্ষা
২) পাবলিক পরীক্ষা
৩) বৃত্তি পরীক্ষা

১) অভ্যন্তরীণ পরীক্ষা- যেমন- বার্ষিক পরীক্ষা, অর্ধ-বার্ষিক পরীক্ষা, টার্ম ফাইনাল পরীক্ষা, মাসিক পরীক্ষা, শ্রেণি পরীক্ষা ইত্যাদি।
২) পাবলিক পরীক্ষা- যেমন- এস.এস.সি এবং এইচ.এস.সি পরীক্ষা হল পাবলিক পরীক্ষার উদাহরণ।
৩) বৃত্তি পরীক্ষা- যেমন- সংশ্লিষ্ট শিক্ষা অধিদপ্তর এই পরীক্ষা গ্রহণ করে থাকে।

পরীক্ষার কাজ

পরীক্ষার কাজ : ব্যাপক অর্থে পরীক্ষার কাজগুলো হল -

১। শিক্ষার্থীর বিভিন্ন বিষয়ের শিখন অগ্রগতি মূল্যায়ন করা।
২। শিক্ষার্থীর পাঠের অগ্রগতি জানা এবং কোন বিষয়ে শিক্ষার্থীর দুর্বলতা চিহ্নিত করে তা দূরীভূত করা।
৩। শিক্ষার্থীর বিশেষ দক্ষতা বা প্রবণতা বা ঝোঁক পরিমাপ করা।
৪। শিক্ষার্থী পরবর্তী বা উচ্চতর পর্যায়ে পড়াশুনার জন্য সক্ষম কিনা তা যাচাই করা।
৫। সর্বোত্তম শিক্ষার্থী চিহ্নিত করা এবং দুর্বল শিক্ষার্থী চিহ্নিত করে প্রয়োজনীয় নিরাময়মূলক ব্যবস্থা গ্রহণ করা।
৬। অভিভাবকদের তাদের সন্তানদের শিখন অগ্রগতি সম্পর্কে জানতে দিয়ে সন্তানদের জন্য বিনিয়োগকৃত অর্থ ও শ্রম সঠিকভাবে কাজে লাগছে কিনা সে সম্পর্কে অবহিত করা।

পরীক্ষার কাজ কেবল শিক্ষার্থী কর্তৃক কয়েকটি প্রশ্নের উত্তর লেখা এবং শিক্ষক কর্তৃক তা পরীক্ষার মাধ্যমে যেমন খুশি তেমনভাবে একটি নম্বর প্রদানের মধ্যে সীমাবদ্ধ নয়। তাই প্রচলিত পরীক্ষার রয়েছে কিছু সীমাবদ্ধতা- যেমন, পরীক্ষায় যথার্থতা ও নির্ভরযোগ্যতার অভাব :

আমাদের মাধ্যমিক শিক্ষা প্রতিষ্ঠানসমূহে প্রচলিত পরীক্ষাগুলোর সবচেয়ে বড় দুর্বলতা হল নির্ভরশীলতা এবং যথার্থতার অভাব, কারণগুলো হল-

১। রচনামূলক প্রশ্নের প্রাধান্য, ফলে শিক্ষকদের মধ্যে নম্বর প্রদানে বিভিন্নতা রয়েছে।

২। নৈর্ব্যক্তিক অভীক্ষাগুলো আদর্শায়িত নয়।

৩। সকল বিষয়বস্তু থেকে প্রশ্ন করা হয় না।

৪। শিক্ষার্থীরা বিভিন্ন বিষয়ে বিভিন্ন নম্বর পায়। যেমন-বাংলাতে এক ধরনের নম্বর আবার বিজ্ঞানে বা অংকে আরেক ধরনের নম্বর পায়।

পরীক্ষায় যথার্থতা ও নির্ভরযোগ্যতা বাড়াতে হলে প্রয়োজনীয় পদক্ষেপ গ্রহণ করতে হবে। যেমন-

১। প্রশ্নের মান উন্নত করতে হবে

২। বিভিন্ন বিষয়ের নম্বর প্রদানে সামঞ্জস্যহীনতা দূর করার ব্যবস্থা গ্রহণ করতে হবে।

৩। নম্বর প্রদানে পরীক্ষক কর্তৃক স্কেল ব্যবহার করতে হবে।

তাছাড়া পরীক্ষা হল শিক্ষার্থীদের মেধা যাচাইয়ের কৌশল। এর উপর শিক্ষার্থীদের ভবিষ্যত জীবন নির্ভর করে। আর এ পরীক্ষা পদ্ধতিই যদি ত্রুটিপূর্ণ হয় তবে ভবিষ্যত হয়ে পড়বে অনিশ্চিত।

নিম্নে বাংলাদেশে গতানুগতিক পরীক্ষা পদ্ধতির ত্রুটিসমূহ দেয়া হল।

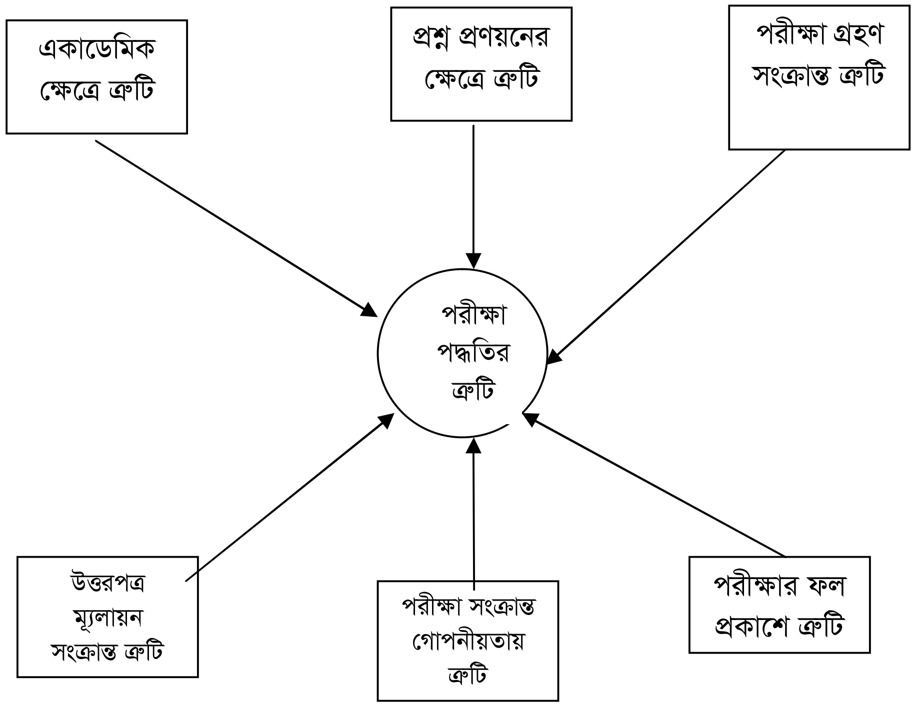

(ক) একাডেমিক ক্ষেত্রে ত্রুটি

১। গতানুগতিক পদ্ধতিতে প্রশ্নপত্র প্রণয়ন করা।

২। শিক্ষার্থীদের নোট বই মুখস্থ করার প্রবণতা।

৩। যোগ্য ও মেধাবী শিক্ষকের অপর্যাপ্ততা ।

৪। রাজনৈতিক সন্ত্রাসের কারণে একাডেমিক কর্মকাণ্ডে স্থবিরতা।

৫। পাঠ পরিকল্পনা ও একাডেমিক কর্মকাণ্ডের অভাব।

৬। প্রাইভেট টিউশনিতে শিক্ষকদের ব্যস্ততার কারণে শ্রেণি শিক্ষণে অনীহা।

৭। শ্রেণিকক্ষে নিম্নতর পাঠদানের মান।

(খ) প্রশ্ন প্রণয়নের ক্ষেত্রে ত্রুটি

১। প্রশ্ন প্রণেতাদের পেশাগত প্রশিক্ষণের অভাব।

২। প্রশ্নের গুণগত মান অনুন্নত

৩। মডারেটরগণ অধিকাংশই শিক্ষা প্রশাসক। তাই বিষয়বস্তুর সাথে তারা তেমন কোন পরিচিত নন। ফলে উপযুক্ত মডারেশন হয় না।

৪। প্রশ্ন প্রণেতাগণ অনেক সময় শ্রেণি শিক্ষক না হওয়ায় শিক্ষাক্রম ও পাঠ্য বিষয়বস্তু অনুযায়ী প্রশ্ন হয় না।

(গ) পরীক্ষা সংক্রান্ত ত্রুটি

১। পরীক্ষা কেন্দ্রে অপর্যাপ্ত আসন ব্যবস্থা। ফলে চাপাচাপি করে বসতে হয় শিক্ষার্থীদের। এতে করে পরীক্ষা গ্রহণে প্রতিবন্ধকতা দেখা দেয়।

২। হল সুপার ও কক্ষ পরিদর্শকের প্রশিক্ষণের অভাব।

৩। পরীক্ষা কেন্দ্রের সুষ্ঠু পরিবেশ না থাকা।

৪। প্রশ্নপত্রের গোপনীয়তা রক্ষার অভাব।

৫। পরীক্ষা কেন্দ্র নির্বাচনে সুনির্দিষ্ট নীতিমালার বাস্তব প্রয়োগের অভাব।

(ঘ) উত্তরপত্র মূল্যায়ন সংক্রান্ত ত্রুটি

১। উত্তরপত্র মূল্যায়নের উপর পরীক্ষকের প্রশিক্ষণের অভাব।

২। উত্তরপত্র মূল্যায়নে যথাযথ নির্দেশনার অভাব।

৩। উত্তরপত্র মূল্যায়নে সময়ের স্বল্পতা।

৪। উত্তরপত্র মূল্যায়নে একাধিক পরীক্ষকের অভাব।

(ঙ) পরীক্ষা সংক্রান্ত কাজে গোপনীয়তা

১। পরীক্ষা গ্রহণ সংক্রান্ত ও ফলাফল প্রকাশ সংক্রান্ত বিভিন্ন গোপনীয় কাগজপত্র শিক্ষাবোর্ড ও শিক্ষা মন্ত্রণালয় থেকে সরাসরি পরীক্ষা কেন্দ্রে পাঠানো হয় ও পুনরায় বোর্ডে পাঠানো হয়। এতে করে সময়ের অপচয় হয় বেশি এবং গোপনীয়তা রক্ষার ক্ষেত্রেও সংশয় থেকে যায়।

২। পরীক্ষা সংক্রান্ত গোপনীয় কাগজপত্র আদান প্রদানে নির্ভরযোগ্য লোকের অভাব।

(চ) পরীক্ষার ফল প্রকাশ সংক্রান্ত ত্রুটি

১। গতানুগতিক পদ্ধতিতে মেধা স্কোরের প্রভাবে অভিভাবগণ অসাধু উপায় অবলম্বনে উৎসাহী হয়।

২। দ্রুত ফলাফল প্রকাশের লক্ষ্যে ফলাফলে ভুল হওয়ার সম্ভাবনা বেশি থাকে।

৩। র‍্যাংকিং এর আদর্শমান এবং স্কোর অনুসারে কৃতকার্য শিক্ষার্থীদের শ্রেণিকরণে সমন্বয়ের অভাব।

৪। ফলাফল প্রস্তুতিতে কম্পিউটারের সমস্যা।

কীভাবে বাংলাদেশে গতানুগতিক পরীক্ষা পদ্ধতির ত্রুটিসমূহ দূর করা করা যায় :

১। শ্রেণিকক্ষে পাঠদানের মান উন্নত করা।

২। প্রশ্ন প্রণেতাদের পেশাগত প্রশিক্ষণের ব্যবস্থা করা

৩। প্রশ্ন প্রণয়নে যথেষ্ট সময় দেয়া

৪। শ্রেণি শিক্ষকদের প্রশ্নপ্রণেতা হিসাবে নির্বাচন করা

৫। প্রশ্ন মডারেটর নিয়োগে বিষয়ভিত্তিক মডারেটরকে গুরুত্ব প্রদান

৬। মাধ্যমিক স্তরের শিক্ষকদের পেশাগত প্রশিক্ষণ (বিএড) বাধ্যতামূলক করা, তাছাড়া বিষয় শিক্ষক বিশেষ করে বিজ্ঞান ও গণিত বিষয়ের শিক্ষকদের চাকুরিকালিন প্রশিক্ষণের ব্যবস্থা করা।

৭। শিক্ষার্থীদের আসন ব্যবস্থা নিশ্চিত করা

৮। পরীক্ষায় অসদুপায় অবলম্বনের বিরুদ্ধে প্রতিরোধ গড়ে তোলা

৯। পরীক্ষার কক্ষ পরিদর্শকদের প্রশিক্ষণের ব্যবস্থা করা।

১০। প্রশ্নে তিন ধরনের প্রশ্ন (রচনামূলক, সংক্ষিপ্ত উত্তর প্রশ্ন ও নৈর্ব্যক্তিক) থাকা প্রয়োজন। রচনামূলক ও সংক্ষিপ্ত প্রশ্নের জন্য ৫০ নম্বর এবং নৈর্ব্যক্তিক প্রশ্নের জন্য ৫০ নম্বর থাকবে।

১১। প্রশ্ন প্রণয়নকারীদের বোর্ড কর্তৃক উপযুক্ত সম্মানী দেয়া।

১২। উত্তরপত্র মূল্যায়নের জন্য পরীক্ষকদের পর্যাপ্ত সময় দেয়া।

১৩। একই উত্তরপত্র একাধিক পরীক্ষক দ্বারা মূল্যায়নের ব্যবস্থা করা।

১৪। কম্পিউটারের সাহায্যে নৈর্ব্যক্তিক অংশের স্কোরিং করা যেতে পারে। (বর্তমানে চালু করা হয়েছে)

১৫। পরীক্ষার প্রশ্নপত্র যাতে ফাস না হয় সে ব্যাপারে বিশেষ ব্যবস্থা রাখা দরকার।

১৬। চিন্তার উদ্রেকমূলক ও সৃজনশীলতার সহায়ক প্রশ্ন পরীক্ষায় অন্তর্ভুক্ত করা।

১৭। কেবলমাত্র সাময়িক বা বার্ষিক পরীক্ষা নয়, শিক্ষার্থীর সর্বাত্মক পরিচয়পত্র (Commulative Record) সংরক্ষণসহ আরও অন্যান্য কৌশল গ্রহণের ব্যবস্থা করা।

১৮। নম্বর প্রদানের সাধারণ নীতিমালা তৈরি করে উত্তরপত্র পরীক্ষণের সাথে সরবরাহ করা। প্রয়োজনে নমুনা উত্তর তৈরি করে সরবরাহ করা।

১৯। পরীক্ষাকে শিক্ষার্থীর সার্বিক অগ্রগতি মূল্যায়নের মাধ্যম হিসেবে দেখা।

২০। লিখিত পরীক্ষার পাশাপাশি মৌখিক পরীক্ষা চালু করা। এতে করে বৃদ্ধিমত্তা, আগ্রহ, মানসিক, দৃষ্টিভঙ্গি, ব্যক্তিগত বৈশিষ্ট্য ইত্যাদি পরিমাপ করা যাবে।

২১। কেবল শিখন অগ্রগতির পরিমাপই নয়, দুর্বল শিক্ষার্থীদের জন্য প্রয়োজনীয় নিরাময়মূলক ব্যবস্থা গ্রহণ করা।

২২। পুরো বই বা বিষয়বস্তু থেকে প্রশ্ন করা।

২৩। মাঝে মাঝে বিষয় শিক্ষকদের জন্য বিদ্যালয় ভিত্তিক স্টাফ ডেভেলপমেন্টের উদ্যোগ গ্রহণ করে এ সম্পর্কে প্রশিক্ষণের ব্যবস্থা করা।

গতানুগতিক পরীক্ষা পদ্ধতিতে বেশ কিছু ত্রুটি থাকা সত্ত্বেও বর্তমানে গ্রেডিং সিস্টেম চালুর ফলে তা হয়তো কাটিয়ে উঠা সম্ভব হবে, তবে উপযুক্ত সমাধানের প্রতি লক্ষ্য রাখলে ত্রুটিসমূহ দূর করাও সম্ভব হবে, যার ফলে শিক্ষার্থীর আচরণের কতটুকু পরিবর্তন হল তা সফলভাবে নিশ্চিত করা সম্ভব হবে।

বর্তমানে সরকার প্রচলিত শিক্ষাক্রমের আওতায় নতুন পদ্ধতিতে কাঠামোবদ্ধ প্রশ্নের মাধ্যমে পরীক্ষা পদ্ধতি সংস্কারের জন্য নিম্নরূপ সিদ্ধান্ত গ্রহণ করেছেন—

(১) এস.এস.সি. পরীক্ষায় ইংরেজি ১ম পত্র, ইংরেজি ২য় পত্র, বাংলা ২য় পত্র, সহজ বাংলা, বাংলা ভাষা ও বাংলাদেশের সংস্কৃতি, কর্মমুখী শিক্ষা, বেসিক ট্রেড, আরবি/সংস্কৃতি, পালি, সংগীত, শারীরিক শিক্ষা ও ক্রীড়া, বাংলা ভাষা ও সাহিত্য, English Language & Literature, চারু ও কারুকলা ব্যতীত অন্যান্য বিষয়সমূহের জন্য—

(ক) প্রচলিত পরীক্ষা পদ্ধতিতে ৫০ শতাংশ নম্বরের বিষয়বস্তু সম্পর্কিত সংক্ষিপ্ত উত্তর-প্রশ্ন, ব্যাখ্যা ও রচনামূলক প্রশ্নের পরিবর্তে ৬০ শতাংশ নম্বরের কাঠামোবদ্ধ প্রশ্ন (Structured Question) ব্যবহার করা হবে। বিদ্যমান শিক্ষাক্রমের উদ্দেশ্যের সাথে সংগতি রেখে চিন্তন দক্ষতার বিভিন্ন স্তর অনুযায়ী কয়েকটি অংশ নিয়ে প্রতিটি

কাঠামোবদ্ধ প্রশ্ন গঠিত হবে। তবে পদার্থ বিজ্ঞান, রসায়ন বিজ্ঞান, জীব বিজ্ঞান, উচ্চতর গণিত, কৃষি শিক্ষা, গার্হস্থ্য অর্থনীতি এবং কম্পিউটার শিক্ষা বিষয়সমূহের ক্ষেত্রে ৪০ শতাংশ নম্বরের কাঠামোবদ্ধ প্রশ্ন ব্যবহার করা হবে।

(খ) বহু নির্বাচনী প্রশ্নের (MCQ) জন্য বর্তমানে নির্ধারিত ৫০ শতাংশ নম্বরের পরিবর্তে ৪০ শতাংশ নম্বর নির্ধারিত থাকবে। তবে পদার্থ বিজ্ঞান, রসায়ন বিজ্ঞান, জীব বিজ্ঞান, উচ্চতর গণিতে ৩৫ শতাংশ, কম্পিউটার শিক্ষা বিষয়ে ৩০ শতাংশ এবং কৃষি শিক্ষা ও গার্হস্থ্য অর্থনীতি বিষয়ে ২৫ শতাংশ নম্বর বহুনির্বাচনী প্রশ্নের জন্য নির্ধারিত থাকবে।

(গ) প্রতিটি বহুনির্বাচনী প্রশ্নের জন্য ১ মিনিট সময় বরাদ্দ থাকবে। এই হিসাবে বহুনির্বাচনী প্রশ্নপত্রের সময় বাদ দিয়ে অবশিষ্ট সময় কাঠামোবদ্ধ প্রশ্নের জন্য বরাদ্দ থাকবে।

(ঘ) যে সকল বিষয়ে কাঠামোবদ্ধ প্রশ্নের জন্য ৬০ শতাংশ নম্বর নির্ধারিত সে সকল বিষয়ের পরীক্ষায় ৯টি প্রশ্ন থাকবে এবং সেখান থেকে ৬টি প্রশ্নের উত্তর দিতে হবে। যে সকল বিষয়ে কাঠামোবদ্ধ প্রশ্নের জন্য ৪০ শতাংশ নম্বর নির্ধারিত সে সকল বিষয়ের পরীক্ষায় ৬টি প্রশ্ন থাকবে এবং সেখান থেকে ৪টি প্রশ্নের উত্তর দিতে হবে।

(ঙ) প্রশ্ন প্রণেতাগণ বিদ্যমান শিক্ষাক্রমের উদ্দেশ্যের সঙ্গে সঙ্গতি রেখে সংশ্লিষ্ট বিষয়ের সকল বিষয়বস্তু (Content Coverage) বিবেচনার এনে চিন্তন দক্ষতার বিভিন্ন স্তর অনুযায়ী বহুনির্বাচনী প্রশ্নপত্র তৈরি করবেন। এজন্য বোর্ড কর্তৃক নির্ধারিত নির্দেশক ছক (Specification Grid) অনুসরণ করতে হবে।

(চ) উত্তরপত্র মূল্যায়ন সঠিক ও নির্ভরযোগ্য করবার জন্য প্রশ্নপ্রণেতাগণ প্রশ্নপত্রের সঙ্গে নমুনা উত্তর (Model Answer) ও নম্বর প্রদান নির্দেশিকা (Marking Scheme) বোর্ড কর্তৃপক্ষকে সরবরাহ করবেন।

(ছ) পরীক্ষকগণ উত্তরপত্র মূল্যায়নকালে প্রধান পরীক্ষক কর্তৃক সরবরাহকৃত নমুনা উত্তর এবং নম্বর প্রদান নির্দেশিকা অনুসরণ করবেন। উত্তরপত্র প্রকৃত মূল্যায়নের পূর্বে প্রধান পরীক্ষকের তত্ত্বাবধানে পরীক্ষকগণ উত্তরপত্রে নমুনা নম্বর প্রদান (Sample Marking) অনুশীলনের মাধ্যমে প্রকৃত নম্বর প্রদানকে নির্ভরযোগ্য করবেন।

(২) এই পরীক্ষা সংস্কার ২০০৯ সালে অনুষ্ঠিতব্য এস.এস.সি. পরীক্ষা থেকে কার্যকর হবে। বিদ্যালয়ের শিখন-শেখানো কার্যক্রম ও অভ্যন্তরীণ পরীক্ষায় এই পরীক্ষা সংস্কার কর্মসূচি বাস্তবায়ন করতে হবে।

(৩) ইংরেজি ১ম পত্র, ইংরেজি ২য় পত্র, বাংলা ২য় পত্র, সহজ বাংলা, বাংলা ভাষা ও বাংলাদেশের সংস্কৃতি, কর্মমুখী শিক্ষা, বেসিক ট্রেড, আরবি/সংস্কৃতি/পালি, সংগীত, শারীরিক শিক্ষা ও ক্রীড়া, বাংলা ভাষা ও সাহিত্য, English Language & Literature এবং চারু ও কারুকলা বিষয়সমূহের নম্বর বণ্টন প্রশ্নের ধরনে বর্তমান প্রচলিত পদ্ধতির কোনোরূপ পরিবর্তন হবে না।

(৪) ফলাফল তৈরির ক্ষেত্রে গ্রেড ও জিপিএ নির্ধারণে বর্তমান নিয়মই বহাল থাকবে।

(৫) মাধ্যমিক ও উচ্চ মাধ্যমিক শিক্ষা বোর্ডসমূহ প্রশ্নপত্র প্রণেতা, মডারেটর, পরীক্ষক ও প্রধান পরীক্ষকগণের জন্য এতদসংশ্লিষ্ট প্রশিক্ষণসহ প্রয়োজনীয় অন্যান্য ব্যবস্থা গ্রহণ করবেন।

মূল্যায়ন

১. পরীক্ষা কী? প্রচলিত বিভিন্ন প্রকার পরীক্ষা পদ্ধতির সংক্ষিপ্ত বর্ণনা দিন।

২. বাংলাদেশে প্রচলিত পরীক্ষা পদ্ধতির সীমাবদ্ধতাসমূহ আলোচনা করুন।

৩. বাংলাদেশে প্রচলিত পরীক্ষা পদ্ধতির সীমাবদ্ধতার দূরীকরণের সম্ভাব্য উপায় সম্পর্কে লিখুন।

সম্ভাব্য উত্তর

পর্ব-ক ও খ

আপনি নিজে উত্তর প্রস্তুত করুন। উত্তরটি আপনার সতীর্থকে দেখান এবং আলোচনা করে আরও উন্নত করুন। প্রয়োজনে টিউটরের সহায়তা নিন।

ইউনিট -১০ **অধিবেশন-৫**

বিদ্যালয়ভিত্তিক মূল্যযাচাইয়ের প্রতিবেদন প্রণয়নের আবশ্যক প্রক্রিয়া

ভূমিকা

শিক্ষণ-শিখন কার্যক্রমে নতুন নতুন কৌশল আবিষ্কারের মাধ্যমে সর্বস্তরের জনগণের সত্যিকারের শিক্ষা গ্রহণের পথ সহজ ও উন্মুক্ত হোক দেশ ও জাতি সে আশা সব সময় পোষণ করে। তবে আমাদের দেশের আর্থসামাজিক অবস্থা, শিক্ষকদের যোগ্যতা ও প্রস্তুতি, শ্রেণি শিখন-শিক্ষণের মান, আভ্যন্তরীণ মূল্যায়ন রেকর্ড, মূল্যায়নের উপকরণ, একাডেমিক সুপারভিশন, শিক্ষক ও অভিভাবকদের নিকট বিদ্যালয়ভিত্তিক মূল্যযাচাই (SBA) একটি নতুন উদ্যোগ।

প্রচলিত পরীক্ষা পদ্ধতিতে সারা বৎসরের বিষয়বস্তুর ও বাইরের অর্জিত জ্ঞান এক সেট প্রশ্নের মাধ্যমে মাত্র তিন ঘণ্টায় মূল্যায়ন করা হয়, এতে শিক্ষার্থীর সারা বছরের কাজের মূল্যায়ন করার ব্যবস্থা নেই। যার ফলে প্রচলিত পরীক্ষা পদ্ধতির মাধ্যমে শিক্ষার্থীর সামগ্রিক মূল্যায়ন সম্ভব হয় না। তাছাড়া শিক্ষার্থীরা মননশীল ক্ষেত্রের নিম্নতর স্তরগুলো আয়ত্ত করে এবং জ্ঞানের উচ্চতর স্তরগুলো যেমন- প্রয়োগ, সমস্যা সমাধান, সংশ্লেষণ, বিশ্লেষণ ইত্যাদি স্তরগুলো আয়ত্ত করতে পারে না। এমনকি বিশেষ বিশেষ শিক্ষার্থীর বিশেষ বিশেষ ক্ষেত্রে দক্ষতাগুলো দূর করার উদ্যোগ নেয়ারও পথ থাকে না। এই অবস্থা থেকে পরিত্রাণ পাওয়ার জন্য দেশে স্কুলভিত্তিক মূল্যায়ন পদ্ধতি প্রবর্তনের চিন্তা করা হচ্ছে। মোট কথা মাধ্যমিক পর্যায়ের মূল্য যাচাই ব্যবস্থার পরিসরকে আরও বাড়ানোর উদ্দেশ্যেই বিদ্যালয়ভিত্তিক মূল্যযাচাই চালু করা হয়েছে। এ অধিবেশনে আমরা বিদ্যালয়ভিত্তিক মূল্যযাচাই পদ্ধতি নিয়ে আলোচনা করবো।

উদ্দেশ্য

এ অধিবেশন শেষে আপনি–

- স্কুলভিত্তিক মূল্যায়ন (SBA) কী ও কেন এবং এর উপাদানগুলো ব্যাখ্যা করতে পারবেন।
- SBA পদ্ধতির সুবিধা ও অসুবিধা শনাক্ত করতে পারবেন।
- SBA মূল্যায়নের প্রতিবেদন প্রণয়নের আবশ্যক প্রক্রিয়া বর্ণনা করতে পারবেন।

পর্বসমূহ

পর্ব-ক : স্কুলভিত্তিক মূল্যায়ন কী ও এর উপাদানসমূহ

স্কুলভিত্তিক মূল্যায়ন হল শিক্ষাক্রমে বর্ণিত উদ্দেশ্য অর্জনের জন্য বিষয়ভিত্তিক শিক্ষক কর্তৃক শিক্ষার্থীর ধারাবাহিক মূল্যায়ন প্রক্রিয়া। এর উপাদানগুলো হলঃ এ্যাসাইনমেন্ট, মূল্যবোধ ও সততা, নেতৃত্বের গুণাবলি, নিয়মানুবর্তিতা, খেলাধুলায় কৃতিত্ব, সাংস্কৃতিক কর্মকাণ্ডে অংশগ্রহণ, বিজ্ঞানবিষয়ক ব্যবহারিক ক্লাশ ও আচরণ।

পর্ব-খ : স্কুলভিত্তিক মূল্যায়নের সুবিধা ও অসুবিধা

স্কুলভিত্তিক মূল্যায়নের সুবিধা ও অসুবিধা দুইই রয়েছে। সুবিধা ও অসুবিধার মধ্যে রয়েছে-

সুবিধাঃ শিক্ষাক্রমে বর্ণিত উদ্দেশ্যগুলো অর্জিত হবে, ফল বিপর্যয় রোধ হবে, শ্রেণিকক্ষে উপস্থিতির হার বৃদ্ধি পাবে, শিক্ষার মান উন্নত হবে।

অসুবিধাঃ শিক্ষকের পক্ষপাতিত্বের সুযোগ সৃষ্টি হবে, প্রভাবশালী মহলের চাপ বৃদ্ধি পাবে, অভিভাবকদের সাথে শিক্ষকদের অসন্তোষ সৃষ্টি হতে পারে, বেশি নাম্বার পাবার আশায় প্রাইভেট টিউশনির প্রতি শিক্ষার্থী ও অভিভাবকদের ঝোঁক বাড়তে পারে।

স্কুলভিত্তিক মূল্যায়নের সুবিধা ও অসুবিধাগুলো নিম্নে প্রদত্ত হল, সেখান থেকে সুবিধা ও অসুবিধাগুলোর নম্বর প্রযোজ্য ছকে লিখুন।

১। শিক্ষার্থীদের শ্রেণির কাজ, বাড়ির কাজ, ক্লাস টেস্ট, এ্যাসাইনমেন্ট ও বিভিন্ন শিখন দক্ষতা ইত্যাদি কার্যক্রমের মূল্যযাচাই সম্ভব হবে,

২। শিক্ষকদের সামাজিক মর্যাদা বৃদ্ধি পাবে,

৩। শিখন-শেখানো কার্যক্রমে শিক্ষক-শিক্ষার্থীর কর্মতৎপরতা বৃদ্ধি পাবে,

৪। পক্ষপাতিত্বের সুযোগ সৃষ্টি হতে পারে,

৫। নীতিবান শিক্ষকদের নিরাপত্তা জনিত সমস্যা সৃষ্টি হতে পারে,

৬। প্রাইভেট টিউশনি বজায় রাখার জন্য সংশ্লিষ্ট শিক্ষকগণ নিজের পছন্দের শিক্ষার্থীদের অধিক নম্বর প্রদান করতে পারে,

৭। অধিকাংশ ক্ষেত্রে কোন প্রকার মূল্যায়ন না করে কেবল অনুমানের ভিত্তিতে ৩০ শতাংশ নম্বর প্রদান করা হবে,

৮। বেশি নম্বরের আশায় প্রাইভেট টিউশনির প্রতি শিক্ষার্থী ও অভিভাবকের ঝোঁক বাড়তে পারে,

৯। মূল্যায়ন ব্যবস্থায় নির্ভরযোগ্যতা, যথার্থতা বৃদ্ধি পাবে এবং পিছিয়ে পড়া শিক্ষার্থীরা বিশেষভাবে উপকৃত হবে,

১০। মূল্য যাচাইয়ের বিভিন্ন কলা-কৌশল বাস্তবে প্রয়োগ করার ফলে শিক্ষকের পেশাগত দক্ষতা বৃদ্ধি পাবে,

১১। বিদ্যালয়ে শিক্ষার্থীর উপস্থিতি বাড়বে এবং শিক্ষা গ্রহণে আগ্রহ বৃদ্ধি পাবে,

১২। বেশির ভাগ শিক্ষকেরই শ্রেণিতে পাঠদান করার মত যথেষ্ট প্রশিক্ষণ না থাকার কারণে শ্রেণিকক্ষে ফাঁকি দেওয়ার প্রবণতা বৃদ্ধি পাবে,

১৩। অভিভাকদের সাথে শিক্ষকের অসন্তোষ দৃষ্টি হতে পারে,

১৪। কিছু কিছু সংশ্লিষ্ট শিক্ষক দুর্নীতির সুযোগ নিতে পারে,

১৫। শিক্ষার্থীরা পড়াশুনার ব্যাপারে সারা বছর ব্যস্ত থাকবে, ফলে বিষয় সম্পর্কে পুরোপুরি জ্ঞান অর্জন সম্ভব হবে। পরীক্ষার আগে তাড়াহুড়া করে বেশি পড়ার চাপ কমে যাবে,

১৬। শুধু পরীক্ষার মাধ্যমে ফলাফল নির্ধারণের পরিবর্তে শিক্ষার্থীদের সারা বছরের কর্মকাণ্ডের মূল্যযাচাইয়ের ওপর এবং চূড়ান্ত পরীক্ষায় প্রাপ্ত নম্বরের সমন্বয়ে ফলাফল নির্ধারিত হবে,

১৭। মূল্যযাচাইয়ের বিভিন্ন কলাকৌশল বাস্তবে প্রয়োগ করার ফলে শিক্ষকের পেশাগত দক্ষতা বৃদ্ধি পাবে,

১৮। মূল্যায়ন ব্যবস্থায় নির্ভরযোগ্যতা, যথার্থতা বৃদ্ধি পাবে এবং পিছিয়ে পড়া শিক্ষার্থীরা বিশেষভাবে উপকৃত হবে,

১৯। শিক্ষক ও শিক্ষার্থীর মধ্যে আত্মিক ও বন্ধুত্বপূর্ণ সম্পর্ক গড়ে উঠবে,

২০। শিক্ষার্থীরা শিক্ষণ-শিখন কার্যক্রমে অধিক সম্পৃক্ত হবে বলে মুখস্থ করার প্রবণতা কমে যাবে এবং পরীক্ষা ভীতি হ্রাস পাবে।

পর্ব-গ : স্কুলভিত্তিক মূল্যায়নের প্রতিবেদন প্রণয়নের আবশ্যক প্রক্রিয়া

প্রতি বিষয়ে প্রতি সাময়িক পরীক্ষায় ৭০ নম্বরে প্রাপ্ত নম্বর এবং প্রতি সাময়িকের কোর্সওয়ার্কে প্রতি বিষয়ে ৩০ নম্বরে প্রাপ্ত নম্বর একত্রিত করে প্রতি সাময়িকের প্রতিবেদন তৈরি করতে হবে। প্রতি বিষয়ে কোর্সওয়ার্কের ৩০ নম্বরের বিভাজন নিচে দেখানো হল:

	সর্বোচ্চ
শ্রেণি অভীক্ষা	– ৫ নম্বর
শ্রেণির কাজ	– ৫ নম্বর
বাড়ির কাজ	– ৫ নম্বর
নির্ধারত কাজ (Assignment)	– ৫ নম্বর
মৌখিক উপস্থাপনা	– ৫ নম্বর
দলগত কাজ	– ৫ নম্বর

এই প্রতিবেদনে সকল শিক্ষকের ঐকমত্যের ভিত্তিতে প্রতি সাময়িকে শিক্ষার্থীদের বিদ্যালয়-আচরণ এবং তাদের ব্যক্তিক ও সামাজিক মূল্যবোধের একটি বর্ণনামূলক মূল্যায়নও অন্তর্ভুক্ত করতে হবে এবং বিদ্যালয়ে শিক্ষার্থীর অনুপস্থিত দিনের সংখ্যাও প্রতিবেদনে উল্লেখ করতে হবে।

এ বিষয়ে বিস্তারিত বিবরণ মূল শিখনীয় বিষয়ে দেখুন এবং নিচের ছকটি পূরণ করুন।

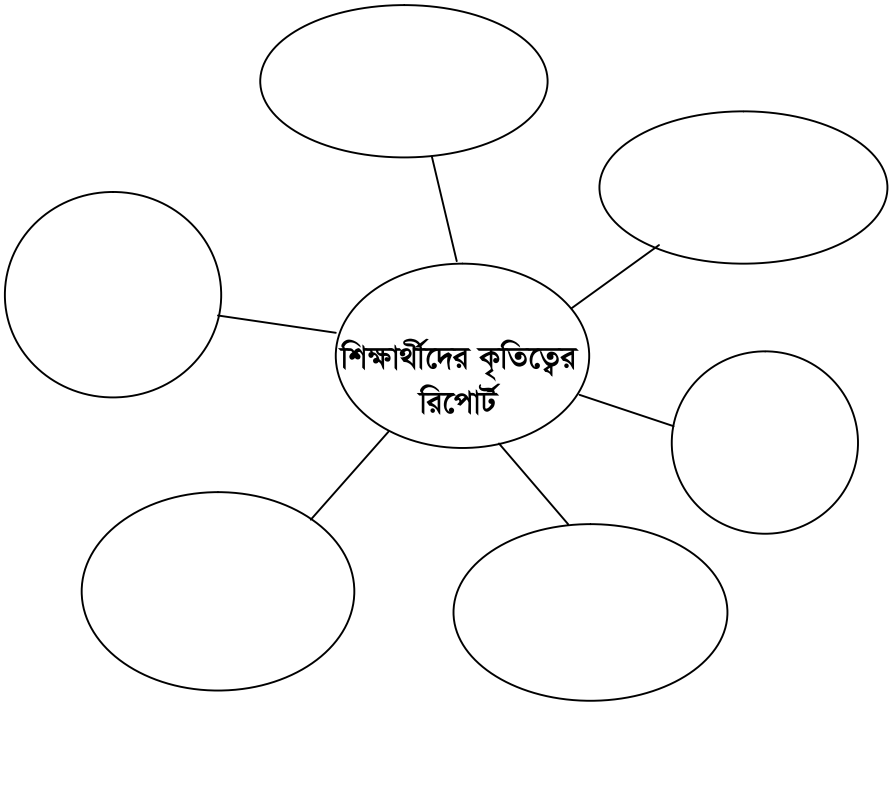

ইউনিট -১০ **অধিবেশন-৫**

মূল শিখনীয় বিষয়

বিদ্যালয়ভিত্তিক মূল্য যাচাইয়ের প্রতিবেদন প্রণয়নের আবশ্যক প্রক্রিয়া

এস বি এ

শিক্ষণ-শিখন কার্যক্রমে নতুন নতুন কৌশল আবিষ্কারের মাধ্যমে সর্ব স্তরের জনগণের সত্যিকারের শিক্ষা গ্রহণের পথ সহজ ও উন্মুক্ত হোক দেশ ও জাতি সে আশা সব সময় পোষণ করে। তবে আমাদের দেশের আর্থসামাজিক অবস্থা, শিক্ষকদের যোগ্যতা ও প্রস্তুতি, শ্রেণি শিখন-শিক্ষণের মান, আভ্যন্তরীণ মূল্যায়ন রেকর্ড, মূল্যায়নের উপকরণ, একাডেমিক সুপারভিশন, শিক্ষক ও অভিভাকদের নিকট বিদ্যালয়ভিত্তিক মূল্যযাচাই (SBA) একটি নতুন উদ্যোগ।

প্রচলিত পরীক্ষা পদ্ধতিতে সারা বৎসরের বিষয়বস্তুর ও বাইরের অর্জিত জ্ঞান এক সেট প্রশ্নের মাধ্যমে মাত্র তিন ঘণ্টায় মূল্যায়ন করা হয়, এতে শিক্ষার্থীর সারা বছরের কাজের মূল্যায়ন করার ব্যবস্থা নেই। যার ফলে প্রচলিত পরীক্ষা পদ্ধতির মাধ্যমে শিক্ষার্থীর সামগ্রিক মূল্যায়ন সম্ভব হয় না। তাছাড়া শিক্ষার্থীরা মননশীল ক্ষেত্রের নিম্নতর স্তরগুলো আয়ত্ত করে এবং জ্ঞানের উচ্চতর স্তরগুলো যেমন- প্রয়োগ, সমস্যা সমাধান, সংশ্লেষণ, বিশ্লেষণ ইত্যাদি স্তরগুলো আয়ত্ত করতে পারে না। এমনকি বিশেষ বিশেষ শিক্ষার্থীর বিশেষ বিশেষ ক্ষেত্রে দক্ষতাগুলো দূর করার উদ্যোগ নেয়ারও পথ থাকে না। এই অবস্থা থেকে পরিত্রাণ পাওয়ার জন্য দেশে স্কুলভিত্তিক মূল্যায়ন পদ্ধতি প্রবর্তনের চিন্তা করা হচ্ছে। মোটকথা মাধ্যমিক পর্যায়ের মূল্যযাচাই ব্যবস্থার পরিসরকে আরও বাড়ানোর উদ্দেশ্যেই বিদ্যালয়ভিত্তিক মূল্যযাচাই চালু করা হয়েছে।

স্কুলভিত্তিক মূল্যায়ন কী?

এস বি এ কী?

স্কুলভিত্তিক মূল্যায়ন হল শিক্ষাক্রমের বর্ণিত উদ্দেশ্য অর্জনের জন্য বিষয়ভিত্তিক শিক্ষক কর্তৃক শিক্ষার্থীর ধারাবাহিক মূল্যায়ন প্রক্রিয়া। এ প্রক্রিয়া শিক্ষা বছরে শিক্ষাদান কর্মসূচির অঙ্গ হিসাবে শিক্ষার্থীর বিষয়ভিত্তিক, গঠনমূলক ও চূড়ান্ত মূল্য যাচাইয়ের ব্যবস্থা। এর মাধ্যমে শিক্ষক সমগ্র বছরব্যাপী শিক্ষার্থীর মননশীল, আবেগিক ও মনোপেশিজ বা দক্ষতার সার্বিক মূল্যায়ন করতে প্রয়াস পাবেন।

বিদ্যালয় ভিত্তিক মূল্যায়নে শিক্ষার্থীদের কোর্সওয়ার্ক সম্পৃক্ত কার্যাবলি

বিদ্যালয়ভিত্তিক মূল্যায়নের মূল কথা হচ্ছে শিক্ষার্থী প্রতিদিন শ্রেণিতে বা বাড়িতে কোর্স সম্পর্কিত যে সব কাজ সম্পাদন করে তার ভিত্তিতে শিখনে তার অগ্রগতির মূল্যায়ন করা। সাময়িক বা চূড়ান্ত পরীক্ষায় প্রাপ্ত নম্বর নির্ভরযোগ্য মূল্যায়নের অংশ হিসাবে বিবেচনা করা হয়ে থাকে।

মূল্যায়নের লক্ষ্য দুটি। একটি হল, শিখন অগ্রগতির ধারাবাহিক মূল্যায়ন (AFL Assessment For Learning)। অন্যটি হল, শিখন-শেষে পরীক্ষার মাধ্যমে শিক্ষার্থীর কৃতিত্বের মূল্যায়ন (AOL - Assessment of Learning)।

ষষ্ঠ-নবম শ্রেণির এসবিএ-এর জন্য শিক্ষার্থীর কোর্সওয়ার্ককে ৬টি ক্ষেত্র চিহ্নিত করা হয়েছে, যেমন :

(১) শ্রেণি-অভীক্ষা
(২) শ্রেণির কাজ ও ব্যবহারিক কাজ
(৩) বাড়ির কাজ
(৪) নির্ধারিত কাজ
(৫) মৌখিক উপস্থাপন
(৬) দলগত কাজ

তাছাড়া মূল্যায়নের অন্যান্য উপাদানসমূহ নিম্নরূপঃ

- ক্লাশে উপস্থিতি ও শিক্ষা গ্রহণে আগ্রহ
- শিক্ষার্থীর বিষয়বস্তুতে কৃতিত্ব অর্জন
- শিক্ষার্থীর অনুসন্ধানমূলক দক্ষতা
- মূল্যায়ন (শ্রেণিভিত্তিক, সাপ্তাহিক, মাসিক, অর্ধবার্ষিক ও বার্ষিক পরীক্ষা)
- এ্যাসাইনমেন্ট (একক/দলীয়)
- মূল্যবোধ ও সততা
- বক্তব্য উপস্থাপন/একক ও দলভিত্তিক আলোচনা
- নেতৃত্বের গুণাবলি
- নিয়মানুবর্তিতা
- ব্যক্তিগত ও যোগাযোগ দক্ষতা
- সহযোগিতামূলক দক্ষতা

- সাংস্কৃতিক কর্মকাণ্ডে অংশগ্রহণ
- খেলাধুলার কৃতিত্ব
- বিজ্ঞান বিষয়ক ব্যবহারিক ক্লাস
- আচরণ
- বই পড়ার প্রতিযোগিতায় অংশগ্রহণ
- সামাজিক গুণাবলি ও নৈতিক মূল্যবোধ

প্রধান শিক্ষক নিজ স্কুলের আদর্শ ও সংস্কৃতি অনুসারে অতিরিক্ত দক্ষতাও এর সঙ্গে যুক্ত করতে পারেন। যেমন-

- বিজ্ঞান মেলায় অংশগ্রহণ
- বৃক্ষরোপণ, বৃক্ষের যত্ন ও বাগান করা
- সমবায়ের ভিত্তিতে অর্থনৈতিক কর্মকাণ্ডে অংশগ্রহণ
- শিক্ষামূলক ভ্রমণ
- চিত্রাঙ্কন প্রতিযোগিতা
- দেয়াল পত্রিকা উদ্বোধন

শ্রেণি অভীক্ষা

শ্রেণি-অভীক্ষা নতুন কিছু নয়। অনেক শিক্ষকই তাঁদের শিক্ষার্থীদের অগ্রগতি যাচাইয়ের জন্য নিয়মিত অভীক্ষা নিয়ে থাকেন। তবে শিক্ষকগণ প্রায়ই আনুষ্ঠানিকভাবে অভীক্ষাগুলোর ফলাফল লিপিবদ্ধ/সংরক্ষণ করেন না এবং এগুলোকে সাময়িক বা বার্ষিক পরীক্ষা শেষে শিক্ষার্থীর সামগ্রিক মূল্যায়নের সাথে অন্তর্ভুক্ত করেন না।

ক্লাস চলাকালে বিষয়-শিক্ষকগণ শ্রেণি-অভীক্ষা নিয়ে থাকেন। শিক্ষক অথবা অন্য শিক্ষার্থীর সাহায্য ছাড়া একজন শিক্ষার্থীকে এককভাবে প্রদত্ত প্রশ্নের উত্তর দিতে হয়।

শ্রেণি-অভীক্ষার মাধ্যমে শিক্ষার্থীর চিন্তন দক্ষতার অগ্রগতি মূল্যায়ন করা হয়।

মূল্যায়নের ক্ষেত্রগুলো হল :

চিন্তন দক্ষতা

- যা শিখেছে তা স্মরণ করতে পারা,
- যা শিখেছে তা অনুধাবন করতে পারা, লব্ধ ধারণা নিজের ভাষায় প্রকাশ করতে পারা, তথ্যকে শ্রেণিবিন্যাস করতে পারা, সারসংক্ষেপ তৈরি অথবা সম্প্রসারণ বা ব্যাখ্যা করতে পারা
- অর্জিত জ্ঞানকে নতুন পরিস্থিতিতে প্রয়োগ করতে পারা

- ধারণা বা যুক্তিকে বিশ্লেষণ করতে পারা
- কোনো বিষয়ে যুক্তিসহকারে নিজস্ব মতামত ব্যক্ত করতে পারা

সিলেবাসের পরবর্তী পরিচ্ছেদে যাওয়ার পূর্বে শিক্ষকের শিক্ষাদান বেশিরভাগ শিক্ষার্থীদের জন্য সফল হয়েছে কিনা শ্রেণি-অভীক্ষা তা যাচাই করে দেখতে সহায়তা করে।

শ্রেণির কাজ ও ব্যবহারিক কাজ

শ্রেণির কাজ হচ্ছে শ্রেণিতে সম্পাদিত কাজ। যেমনঃ শোনা, পড়া, লিখা, আঁকা, চিন্তন ইত্যাদি।

শ্রেণির এই সব কার্যের কতগুলো পরোক্ষভাবে শিক্ষার্থীর কাজে আসে এবং তাদের অর্জিত অধিকাংশ দক্ষতা ও জ্ঞান তাদের প্রয়োগিক ও ব্যবহারিক জীবনে অনুশীলনের সাথে সংশ্লিষ্ট।

শ্রেণিকক্ষের কিছু কাজ শিক্ষার্থী এককভাবে সম্পন্ন করবে। অন্যান্য কাজ দলগতভাবে সম্পন্ন করতে পারে। এতে করে চিন্তন দক্ষতা ও ব্যক্তিক দক্ষতার উন্নয়ন ঘটবে।

নিম্নে ষষ্ঠ থেকে নবম শ্রেণির শিক্ষার্থীদের জন্য শ্রেণি-কার্যাবলির উদাহরণ দেওয়া হলঃ

- প্রশ্নের উত্তর লিখা
- গাণিতিক সমস্যার সমাধান
- কোন অনুচ্ছেদ বা রচনা লিখন
- পাঠ্যপুস্তক পড়ে টীকা প্রস্তুতকরণ
- মানচিত্র, ডায়াগ্রাম, চার্ট অথবা চিত্র আঁকা
- হিসাব বিজ্ঞানের অনুশীলন

বাড়ির কাজ

বাড়ির কাজ হল বাড়িতে সম্পন্ন করার জন্য শিক্ষক কর্তৃক প্রদত্ত পাঠ সম্পর্কিত কাজ। এটি শ্রেণির কাজের বাইরে অতিরিক্ত কাজ যা শিক্ষার্থী নিজে এককভাবে সম্পন্ন করতে সমর্থ হবে। এটি প্রায়ই শিক্ষার্থীর পাঠ্যপুস্তকের ওপর ভিত্তি করে দেওয়া হবে।

প্রতি সপ্তাহে ৬ষ্ঠ-৯ম শ্রেণির শিক্ষার্থীদের একটি অথবা দুইটি বিষয়ে, বাড়িতে সম্পন্ন করার জন্য কিছু কাজ নির্ধারণ করে দিতে হবে। শুধু পাঠ্যপুস্তক থেকে তুলে দিয়ে বাড়ির কাজ সম্পন্ন করা গেলে চলবে না। বরং বাড়ির কাজ এমন হতে হবে যাতে শ্রেণিকক্ষে অর্জিত ধারণাসমূহ চিন্তা ও প্রয়োগের ক্ষেত্রে কাজে লাগাতে পারে। শিক্ষার্থীদের প্রতিটি বাড়ির কাজ এমন হতে হবে যাতে তারা ২০-৩০ মিনিটের মধ্যে তা সম্পন্ন করতে সমর্থ হয়।

বাড়ির কাজে সাধারণত শিক্ষার্থীর চিন্তন দক্ষতা বিকাশের উপর গুরুত্ব দেওয়া হয়। শিক্ষার্থী পাঠ কতটা অনুধাবন করতে পেরেছে শিক্ষক বাড়ির কাজের মাধ্যমে সে সম্পর্কে প্রয়োজনীয় ফিডব্যাক পেতে পারেন।

বাড়ির কাজের গুরুত্ব

- এটি শিক্ষার্থীর কাজ করার ক্ষমতা বিকাশে এবং আহরিত জ্ঞানকে আরো সুদৃঢ় করতে সহায়তা করে।
- এটি শিক্ষার্থীর শিখনের যত্নশীলতা সম্বন্ধে শিক্ষককে তথ্য প্রদান করে।

যদি অধিকাংশ শিক্ষার্থী বাড়ির কাজ সঠিকভাবে সম্পন্ন করতে না পারে, তবে প্রয়োজনে শিক্ষক পুনরায় উক্ত বিষয়ে পাঠদান করতে পারেন। তিনি বাড়ির কাজের সাধারণ ভুলগুলো শ্রেণিকক্ষে সংশোধন করে দিতে পারেন। যদি কোনো শিক্ষার্থী নিয়মিতভাবে বাড়ির কাজ সমাপ্ত না করে, তবে শিক্ষক তার কারণ খুঁজে বের করবেন এবং বাড়ির কাজ সম্পন্ন করার ব্যাপারে উৎসাহ যোগাবেন।

নির্ধারিত কাজ (Assignments)

নির্ধারিত কাজের মাধ্যমে শিক্ষার্থীদের চিন্তন দক্ষতা, ব্যক্তিক দক্ষতা এবং সমস্যা সমাধানমূলক দক্ষতা বৃদ্ধি পাবে। নির্ধারিত কাজ হলো দীর্ঘ পরিসরের বাড়ির কাজ, যাতে শিক্ষার্থীকে পাঠ্যপুস্তকের বাইরের বিভিন্ন তথ্য ব্যবহার করতে হবে।
নির্ধারিত কাজের একটি গুরুত্বপূর্ণ উদ্দেশ্য হলো শিক্ষার্থীর এককভাবে কাজ করার ক্ষমতা বৃদ্ধি করা।

ব্যক্তিক দক্ষতা

নির্ধারিত কাজ সাধারণত কয়েকটি দিবসের মধ্যে সম্পন্ন করতে হয় এবং শেষে একটি প্রতিবেদন পেশ করতে হয় যেখানে শিক্ষার্থী অর্পিত কাজ সম্পর্কে বিশদ বর্ণনা দিবে অথবা উক্ত কাজ পর্যবেক্ষণে তারা কী পেয়েছে তা উল্লেখ করবে।

একটি নির্ধারিত কাজ সম্পন্ন করতে কী কী করতে হবে এবং প্রতিবেদনে কী কী বিষয়বস্তু থাকবে এ সম্পর্কে শিক্ষার্থীকে স্পষ্ট নির্দেশনা দিতে হবে। শিক্ষক শিক্ষার্থীদের কাজটি সম্পন্ন করার সময় এর অগ্রগতি যাচাই করবেন এবং তাদেরকে উৎসাহ দিবেন।

শিক্ষককে নিশ্চিত হতে হবে যে প্রদত্ত নির্ধারিত কাজ সম্পাদন করার জন্য প্রয়োজনীয় তথ্য বা উপাদান সকল শিক্ষার্থীর নিকট সহজলভ্য।

প্রথমবার যখন শিক্ষার্থীদের কোনো নির্ধারিত কাজ দেওয়া হবে, তখন কাজটি সম্পন্ন করতে যে সব দক্ষতার প্রয়োজন হবে সে দক্ষতাগুলো শিখানোর জন্য উক্ত বিষয়ের শিক্ষককে পাঠের জন্য কিছু সময় ব্যয় করতে হবে।

ষষ্ঠ শ্রেণিতে নির্ধারিত কাজ খুব সাধারণ হবে এবং দুই তিন ধাপের মধ্যে সীমাবদ্ধ থাকবে।

সমস্যা সমাধানমূলক দক্ষতা

নবম শ্রেণির নির্ধারিত কাজ কিছুটা জটিল হবে। শিক্ষার্থীকে কাজের পরিকল্পনা করতে হবে এবং কাজটি করতে কয়েকটি ধাপ অনুসরণ করতে হবে। যেমন অনুসন্ধানের পরিকল্পনা তৈরি করা, উপাত্ত সংগ্রহ ও সংগঠন করা, ফলাফল নির্ধারণ করা এবং প্রতিবেদন তৈরি করা ইত্যাদি। শিক্ষার্থীরা শিক্ষকের সামান্য সাহায্য নিয়েই কাজটি করতে সক্ষম হবে।

দলীয় বা দলগত কাজ

দলীয় বা দলগত কাজের উদ্দেশ্য হল অনেক শিক্ষার্থীকে একই সময়ে শ্রেণিকক্ষে কথা বলার সুযোগ দেয়া। দলীয় কাজ অনেক শিক্ষার্থীর মধ্যে পাঠদান কালে সক্রিয় অংশগ্রহণকে উৎসাহিত করে, দলীয় কাজ শিক্ষার্থীদের যে কোন বিষয়ে আলোচনা করার দক্ষতা বৃদ্ধি করে। কিছু শিক্ষার্থীর ক্ষেত্রে ছোট ছোট দলে বিভক্ত হয়ে দলের শিক্ষার্থীর সঙ্গে এবং অন্য দলের শিক্ষার্থীদের সাথে কথা বলা তাদেরকে জনসম্মুখে কথা বলার দক্ষতা বৃদ্ধিতে সহায়তা করে। দলীয় কাজ শিক্ষার্থীর ব্যক্তিক এবং সামাজিক মূল্যবোধের বিকাশ সাধনে বিশেষ করে সমষ্টিগতভাবে কাজ করার দক্ষতা, নেতৃত্বের গুণাবলি এবং অন্যের দৃষ্টিভঙ্গি ও অনুভূতির সাথে একাগ্রতা প্রকাশ করার দক্ষতা বৃদ্ধিতে সহায়তা করে। তাছাড়া শিক্ষার্থীদের দলীয় কাজ পর্যবেক্ষণ এবং তাদের আলোচনার বিষয়বস্তু শোনার মাধ্যমেও মূল্যায়ন করা যায়।

দলীয় কাজ ব্যবস্থাপনার জন্য কিছু সুপারিশঃ

- শিক্ষার্থীদের উদ্দীপনামূলক কাজ করতে দেওয়া।
- বড় শ্রেণিতে একই বেঞ্চের শিক্ষার্থীরা একটি বা দুটি দলে বিভক্ত হয়ে দল তৈরি করতে পারে।
- শ্রেণিতে বেশিসংখ্যক শিক্ষার্থী হলে দলের প্রত্যেককে একই নম্বর দিতে হবে।
- দলগত কাজ চলাকালীন বিভিন্ন দিনে সুযোগ ও সুবিধা অনুযায়ী সকল শিক্ষার্থীর মূল্যযাচাইয়ের কাজ সম্পাদন করা যেতে পারে।

সহযোগিতামূলক দক্ষতা

অধিক সংখ্যক শিক্ষার্থীর শ্রেণিতে সবাইকে পাঠে সক্রিয় অংশ গ্রহণের সুযোগ করে দেওয়ার উত্তম উপায় হচ্ছে দলগত কাজের ব্যবস্থা করা।

ব্যক্তিক দক্ষতা

এ ছাড়া দলগত কাজ শিক্ষার্থীর একত্রে কাজ করার দক্ষতা ও নেতৃত্বের গুণাবলি অর্জনে এবং অপরের বক্তব্য ও অনুভূতির প্রতি গুরুত্ব প্রদর্শন করার অভ্যাস গঠনে সহায়তা করে।

সামাজিক দক্ষতা

শিক্ষার্থীদের দলগত কাজ পর্যবেক্ষণ এবং তাদের আলোচনা শোনার মাধ্যমে শিক্ষক শিক্ষার্থীর ব্যক্তিক ও সামাজিক মূল্যবোধ যাচাই করার সুযোগ পান।

দলগত কাজের মূল্যায়ন

দলগত কাজের মূল্যায়ন

সহযোগিতামূলক দক্ষতা মূল্যায়নের জন্য শিক্ষককে ধারাবাহিকভাবে প্রত্যেক শিক্ষার্থীকে একক অথবা দলের সদস্য হিসাবে প্রতি সাময়িকে কমপক্ষে তিনবার মূল্যায়ন করে নম্বর সংরক্ষণ করতে হবে।

কোনো একদল শিক্ষার্থীর সহযোগিতামূলক শিখন দক্ষতা মূল্যায়নের জন্য শিক্ষক যে বিষয়গুলো বিবেচনায় রাখবেন:

- দলের সকল সদস্য আলোচনা বা কাজে অংশগ্রহণ করেছে কি না।
- দলের সকল সদস্য একে অপরকে অংশগ্রহণে উৎসাহিত করেছে কি না।
- শিক্ষার্থীরা অপরের মতামত শুনতে এবং অপরকে কাজ করার সুযোগ দিতে ইচ্ছুক কি না।
- দলগত আলোচনায়, দলের সদস্যরা ভিন্নমত ব্যক্ত করলে অথবা কাজের ধারা সম্পর্কে ভিন্নমত পোষণ করলে পরবর্তীতে আলোচনার মাধ্যমে সদস্যরা একই মতে উপনীত হতে পেরেছেন কি না।

মৌখিক উপস্থাপনা

SBA এর ক্ষেত্রে প্রত্যেকটি শিক্ষার্থীর মৌখিক দক্ষতা মূল্য যাচাইয়ের জন্য শিক্ষক কর্তৃক শ্রেণিকক্ষে প্রশ্ন জিজ্ঞাসা অথবা ব্যবহারিক কাজ অথবা দলীয় আলোচনার অংশ হিসেবে শিক্ষার্থীদের কথাবলা এবং আলোচনার সুযোগ দিতে হবে। প্রত্যেক শিক্ষার্থীর মৌখিক উপস্থাপনার ক্ষেত্রে নম্বর প্রদানের জন্য শিক্ষক প্রতিটি সাময়িকে কমপক্ষে তিনবার রীতিবদ্ধ

ভাবে শিক্ষার্থীর মৌখিক দক্ষতার মূল্য যাচাই করবেন। বাংলা এবং ইংরেজি বিষয়ের শ্রেণিকক্ষে একক এবং মৌখিক উপস্থাপনা শিক্ষার্থীর শিখনের একটি গুরুত্বপূর্ণ অংশ। অন্য বিষয়েও একক উপস্থাপনার দ্বারা শিক্ষার্থীর দলে কথা বলার আস্থা এবং দক্ষতা বৃদ্ধি করা যায়।

উদাহরণ

৬ষ্ঠ-৯ম শ্রেণিতে একক মৌখিক উপস্থাপনার কিছু উপযুক্ত উদাহরণ:

- বাংলা কবিতা আবৃত্তি
- ইংরেজিতে কোনো চলতি বিষয়ের উপর একটি সংক্ষিপ্ত আনুষ্ঠানিক উপস্থাপনা
- বিতর্কে অংশগ্রহণ অথবা সামাজিক বিজ্ঞান বিষয়ে ভূমিকাভিনয়ে অংশগ্রহণ
- বিজ্ঞানের ব্যবহারিক কাজে অনুসৃত প্রক্রিয়ার উপর শিক্ষকের প্রশ্নের উত্তর প্রদান
- গণিতের বিশেষ বিশেষ শব্দসমূহের ব্যাখ্যা করা
- ধর্মীয় বিষয় থেকে দ্রুতপঠন
- অতিথি বক্তাকে কৃষি শিক্ষা অথবা গার্হস্থ্য অর্থনীতি বিষয়ে প্রস্তুত প্রশ্ন জিজ্ঞাসা করা।
- একটি ছবি, একটি চার্ট, একটি গ্রাফ অথবা একটি মডেলের বৈশিষ্ট্য বিষয়ে মৌখিকভাবে বর্ণনা করা।

নিম্নলিখিত নীতি বা নির্দেশক ব্যবহার করে শিক্ষক প্রত্যেক শিক্ষার্থীর মৌখিক দক্ষতা মূল্যযাচাই করে নম্বর প্রদান করবেন ঃ

- শিক্ষার্থী শ্রেণিকক্ষে অথবা ছোট দলে কথা বললে তা শোনা যায় কি?
- শিক্ষার্থীর বক্তব্য কি বোঝা যায়?
- শিক্ষার্থী নিয়মিত এবং স্বতঃস্ফূর্তভাবে শ্রেণিতে প্রশ্নের উত্তর দেয় কি না এবং দলগত আলোচনায় অংশগ্রহণ করে কি না?
- শিক্ষার্থী আত্মবিশ্বাসের সাথে কথা বলতে পারে কী না বা বক্তব্য সঠিক কি না?

নিম্নলিখিত চেকলিস্ট অনুযায়ী শিক্ষক রীতিবদ্ধভাবে মূল্যযাচাই লিপিবদ্ধ করবেন:

মৌখিক উপস্থাপনা																				
	মূল্যায়ন নির্দেশক												সম্মিলিত ফলাফল							
শিক্ষার্থীর নাম	শোনা যায়			বোঝা যায়			স্বতঃস্ফূর্তঃ অংশগ্রহণ			আত্মবিশ্বাস			সার সংক্ষেপ			পয়েন্ট			মোট	SBA নম্বর
	৩	২	১	৩	২	১	৩	২	১	৩	২	১	৩	২	১	৩	২	১	৩৬	২
আছিফ	√	√√		√√√			√√	√		√√	√		৮	৪		২৪	৮		৩২	৫
সঞ্চিতা		√	√√		√√	√			√√√			√√√	-	৩	৯	-	৬	৯	১৫	২

৩ = অতি উত্তম; ২ =উত্তম; ১ = ভাল

মৌখিক উপস্থাপনার মূল্যায়ন নিম্নলিখিতভাবে বিদ্যালয়ভিত্তিক (এসবিএ) নম্বরে রূপান্তর করতে হবে :

৩০-৩৬ পয়েন্ট = ৫ নম্বর: ২৫-২৯ পয়েন্ট = ৪ নম্বর; ২০-২৪ পয়েন্ট = ৩ নম্বর; ১৫-১৯ পয়েন্ট = ২ নম্বর; ১২-১৪ পয়েন্ট = ১ নম্বর।

সুবিধা

বিদ্যালয় ভিত্তিক মূল্যায়নের সুবিধা:

বিদ্যালয়ভিত্তিক মূল্যায়নের ফলে:

- শ্রেণিকক্ষে উপস্থিতির হার বৃদ্ধি পাবে,
- ফল বিপর্যয় রোধ হবে,
- শিক্ষার্থীর সক্রিয় অংশগ্রহণ বৃদ্ধি পাবে এবং শিক্ষকের অধিক কথা বলার প্রবণতা কমে যাবে,
- শিক্ষার মান উন্নত হবে,
- পাশের হার বেড়ে যাবে,
- শিক্ষক-শিক্ষার্থী সম্পর্ক আরও ঘনিষ্ঠ হবে,
- শিক্ষাক্রমে বর্ণিত উদ্দেশ্যগুলো অর্জিত হবে,
- শিক্ষার্থী আত্মনির্ভরশীল এবং দায়িত্ববোধসম্পন্ন ব্যক্তিরূপে বেড়ে উঠবে,
- শিক্ষককে শিক্ষার্থীদের ব্যক্তিগত পার্থক্য ও শিক্ষা অর্জনের বৈশিষ্ট্য উপলব্ধি করতে মনোযোগী হবেন,
- শিক্ষার্থীগণ সামাজিক, সহানুভূতিশীল ও মানবিক গুণসম্পন্ন সুনাগরিক হয়ে গড়ে উঠবে,
- শিক্ষার্থীরা শিখন-শেখানো কার্যক্রমে অধিক সম্পৃক্ত হবে বলে মুখস্থ করার প্রবণতা কমে যাবে এবং পরীক্ষা ভীতি হ্রাস পাবে,

- মূল্যায়ন ব্যবস্থায় যথার্থতা বৃদ্ধি পাবে এবং মূল্য যাচাই প্রক্রিয়ায় শিক্ষকের অংশগ্রহণ নিশ্চিত হবে,
- শিক্ষার্থীদের মধ্যে সহযোগিতামূলক মনোভাব, যৌক্তিক ক্ষমতার বিকাশ, যোগাযোগ দক্ষতা এবং নেতৃত্বের মনোভাব গড়ে উঠবে,
- শিক্ষার্থীরা পড়াশুনার ব্যাপারে সারা বছর ব্যস্ত থাকবে, ফলে বিষয় সম্পর্কে পুরোপুরি জ্ঞান অর্জন সম্ভব হবে, পরীক্ষার আগে তাড়াহুড়া করে বেশি পড়ার চাপ কমে যাবে,
- মূল্যযাচাইয়ের বিভিন্ন কলা-কৌশল বাস্তবে প্রয়োগ করার ফলে শিক্ষকের পেশাগত দক্ষতা বৃদ্ধি পাবে,
- মূল্যায়ন ব্যবস্থায় নির্ভরযোগ্যতা, যথার্থতা বৃদ্ধি পাবে এবং পিছিয়ে পড়া শিক্ষার্থীরা বিশেষভাবে উপকৃত হবে,
- শিক্ষককে অধিকতর কার্যকর শিক্ষাদান পদ্ধতি, শিক্ষা উপকরণ ও কর্মতৎপরতা উদ্ভাবন করতে সহায়তা করবে এবং প্রেরণা যোগাবে,
- শিক্ষককে শিক্ষার্থীদের ব্যক্তিগত পার্থক্য ও শিক্ষা অর্জনের বৈশিষ্ট্য উপলব্ধি করতে মনোযোগী করবে।
- Bloom Taxonomy অনুযায়ী শিক্ষার্থীদের মূল্যযাচাই সম্ভব হবে,

তাছাড়া শিক্ষার্থীরা

- নিজেদের লক্ষ্য স্থির করতে এবং তা অর্জন করতে সক্রিয় থাকবে,
- নিজের জ্ঞান অর্জনের মাত্রা যাচাই করতে শিখবে এবং সহপাঠীদেরও মূল্যায়ন করতে পারবে,
- একে অন্যের প্রতিভা ও দুর্বলতাগুলো চিহ্নিত করতে সমর্থ হবে,
- যুগপৎ বিভিন্ন ভূমিকায় অবদান রাখতে সমর্থ হবে যেমন, শিক্ষার্থী, সেবক, সহায়তাকারী, মূল্যযাচাইকারী এবং পুনরালোচনাকারী,
- কোন শিক্ষণীয় বিষয় নিজেরা সৃষ্টি করতে, প্রস্তুত করতে, উপস্থাপন করতে এবং নতুন পরিস্থিতিতে প্রয়োগ করার সুযোগ লাভ করবে,
- তাদের প্রচেষ্টা এবং অগ্রগতি উপলব্ধি করতে পারবে,
- কী করতে পারে এবং কী করতে অন্যের সহায়তা প্রয়োজন তা উপলব্ধি করতে পারবে,

[উৎসঃ শিক্ষা কমিশন রিপোর্ট, ২০০৩]

স্কুলভিত্তিক মূল্য যাচাইয়ের অসুবিধাসমূহ:

অসুবিধা

- বেশি নম্বরের আশায় প্রাইভেট টিউশনির প্রতি শিক্ষার্থী ও অভিভাকদের ঝোঁক বাড়বে,
- অভিভাবকদের সাথে শিক্ষকের অসন্তোষ সৃষ্টি হতে পারে,

- বেশির ভাগ শিক্ষকেরই শ্রেণিতে পাঠদান করার মত যথার্থ প্রশিক্ষণ না থাকার কারণে শ্রেণিকক্ষে ফাঁকি দেওয়ার প্রবণতা বৃদ্ধি পাবে,
- কিছু শিক্ষক দুর্নীতির সুযোগ নিতে পারে,
- পক্ষপাতিত্বের সুযোগ সৃষ্টি হতে পারে।

শিক্ষার্থীদের কৃতিত্বের রিপোর্ট

কৃতিত্বের রিপোর্ট

১। সাময়িক-১

প্রতি বিষয়ে প্রথম সাময়িক পরীক্ষায় ৭০ নম্বরে প্রাপ্ত নম্বর এবং প্রথম সাময়িকের কোর্সওয়ার্কে প্রতি বিষয়ে ৩০ নম্বরে প্রাপ্ত নম্বর একত্রিত করে প্রথম সাময়িকের প্রতিবেদন তৈরি করতে হবে। প্রতি বিষয়ে কোর্সওয়ার্কের ৩০ নম্বরের বিভাজন নিচে দেখানো হল:

	সর্বোচ্চ
শ্রেণি অভীক্ষা	– ৫ নম্বর
শ্রেণির কাজ	– ৫ নম্বর
বাড়ির কাজ	– ৫ নম্বর
নির্ধারত কাজ	– ৫ নম্বর
মৌখিক উপস্থাপনা	– ৫ নম্বর
দলগত কাজ	– ৫ নম্বর

এই প্রতিবেদনে সকল শিক্ষকের ঐকমত্যের ভিত্তিতে প্রথম সাময়িকে শিক্ষার্থীদের বিদ্যালয়-আচরণ এবং তাদের ব্যক্তিক ও সামাজিক মূল্যবোধের একটি বর্ণনামূলক মূল্যায়নও অন্তর্ভুক্ত করতে হবে এবং বিদ্যালয়ে শিক্ষার্থীর অনুপস্থিত দিনের সংখ্যাও প্রতিবেদনে উল্লেখ করতে হবে।

২। সাময়িক-২

প্রতি বিষয়ে দ্বিতীয় সাময়িক পরীক্ষায় ৭০ নম্বর প্রাপ্ত নম্বর এবং দ্বিতীয় সাময়িকের কোর্সওয়ার্কে প্রতি বিষয়ে ৩০ নম্বরে প্রাপ্ত নম্বর একত্রিত করে দ্বিতীয় সাময়িকের প্রতিবেদন তৈরি করতে হবে।

এই প্রতিবেদনে সকল শিক্ষকের ঐকমত্যের ভিত্তিতে দ্বিতীয় সাময়িকে শিক্ষার্থীদের বিদ্যালয়-আচরণ এবং তাদের ব্যক্তিক ও সামাজিক মূল্যবোধের একটি বর্ণনামূলক মূল্যায়নও অন্তর্ভুক্ত করতে হবে এবং বিদ্যালয়ে শিক্ষার্থীর অনুপস্থিত দিনের সংখ্যাও প্রতিবেদনে উল্লেখ করতে হবে।

৩। সাময়িক-৩

প্রতি বিষয়ে সাময়িক পরীক্ষায় ৭০ নম্বরে প্রাপ্ত নম্বর এবং তৃতীয় সাময়িকের কোর্সওয়ার্ক প্রতি বিষয়ে ৩০ নম্বরের প্রাপ্ত নম্বর একত্রিত করে তৃতীয় সাময়িকের প্রতিবেদন তৈরি করতে হবে।

এই প্রতিবেদনে সকল শিক্ষকের ঐকমত্যের ভিত্তিতে তৃতীয় সাময়িকে শিক্ষার্থীদের বিদ্যালয়-আচরণ এবং তাদের ব্যক্তিক ও সামাজিক মূল্যবোধের একটি বর্ণনামূলক মূল্যায়নও অন্তর্ভুক্ত করতে হবে এবং বিদ্যালয়ে শিক্ষার্থীর অনুপস্থিতি দিনের সংখ্যাও প্রতিবেদনে উল্লেখ করতে হবে।

তৃতীয় সাময়িকের প্রতিবেদনে আরও থাকবে-

- প্রথম, দ্বিতীয় এবং তৃতীয় সাময়িক পরীক্ষায় প্রতি বিষয়ে মোট ২১০ (৭০×৩) নম্বরে প্রাপ্ত নম্বর।
- বর্ষব্যাপী শিক্ষার্থীদের কোর্সওয়ার্কে প্রতি বিষয়ে ৯০ (৩০×৩) নম্বরে প্রাপ্ত নম্বর।
- শিক্ষার্থীরা বর্ষব্যাপী যে সব সহ-শিক্ষাক্রমিক কার্যাবলিতে (সাংস্কৃতিক কর্মকাণ্ড, খেলাধুলা, ক্রীড়া প্রতিযোগিতা ইত্যাদি) অংশগ্রহণ করেছে তার একটি তালিকাও থাকবে।

বিদ্যালয়ভিত্তিক মূল্যযাচাই: শিখন দক্ষতা

শিখন শেখানো কার্যাবলি চলাকালে শিক্ষার্থী যেসব শিখন দক্ষতা অর্জন করবে এবং যে ভাবে শিক্ষকগণ এসব দক্ষতা মূল্যায়ন করে নম্বর দিতে পারেন, তা নম্বর বণ্টনসহ নিচের ছকে দেখান হলঃ

মূল্যায়ন পদ্ধতি→ দক্ষতা↓	সাময়িক অভীক্ষা	অনুসন্ধানমূলক কাজ এবং প্রজেক্ট এর কাজ	শ্রেণীর কাজ এবং বাড়ির কাজ	দলগত কাজ (প্রজেক্ট ব্যতীত)	মোট
মননশীলতা, কৃতিত্ব ও অনুসন্ধান	১০	১০	১০	১০	৪০
ব্যক্তিগত ও যোগাযোগ বা প্রকাশ করার দক্ষতা	১০	১০	১০	১০	৪০
সহযোগিতা, সামাজিক ও নৈতিক	×	১০	×	১০	২০
মোটঃ	২০	৩০	২০	৩০	১০০

(ক) **মননশীলতা শিখন (Cognitive learning)ঃ** শ্রেণিকক্ষে শিক্ষার্থীর জ্ঞান দক্ষতা ও চিন্তন শক্তি পরিমাপের মাধ্যমে মূল্যায়ন সাপেক্ষে গ্রেডিং করা যেতে পারে। তাছাড়া শিক্ষককে কেবল স্মৃতি পরীক্ষা করলেই চলবেনা তারে বিশ্লেষণ, সর্বায়ন ও বিচার করার ক্ষমতাকেও যাচাই করতে হবে।

(খ) **ব্যক্তিগত ও যোগাযোগ বা প্রকাশ করার দক্ষতাঃ (Personal and Communicative Ability)**

এটি দৃষ্টিভঙ্গি ও চারিত্রিক বিকাশের সঙ্গে সম্পর্কিত এবং দৃষ্টিভঙ্গির বিকাশ ঘটে কোন বিষয় শেখানোর কাজে অংশগ্রহণে ইচ্ছুক থাকার মধ্য দিয়ে। যেমন প্রশ্নের উত্তর দেয়া, দলগত কাজে অংশগ্রহণ, শ্রেণিতে উপস্থিত থাকা, বাড়ির কাজ করা, মনোযোগ দেয়া। আবার যোগাযোগ দক্ষতার সাথে যৌক্তিকতা, বিন্যাস ও উপস্থাপন দক্ষতাও থাকা প্রয়োজন। যেমন- মৌখিক যোগাযোগ দক্ষতা, উপস্থাপন দক্ষতা, বাচনভঙ্গী, শুদ্ধ উচ্চারণ, চিত্রাঙ্কনের মাধ্যমে যোগাযোগ।

(গ) **সহযোগিতা ও সামাজিক মূল্যবোধ (Cooperative and Social Values)**

দলগত কাজে শিক্ষার্থীদের এক একটি দলে ভাগ হয়ে কাজ করতে হয় এবং নিজেরা নিজেদের কাজগুলো দলগুলোর একে অন্যের মধ্যে ভাগ করে নেয়। দলগত কাজে নেতৃত্ব গড়ে ওঠে, কারণ দলের সদস্যদের মধ্যে কেউ নির্দেশনার কাজ করে থাকে। কোন কাজ করতে গিয়ে একটি দল যখন সিদ্ধান্ত গ্রহণ ও তার যৌক্তিকতা নিরূপণ করে তখন দলগত সহযোগিতা বিশেষ গুরুত্ব পেয়ে থাকে। তাছাড়া সামাজিক মূল্যবোধ শিক্ষার্থীদের আচরণের মধ্য দিয়া প্রকাশ পায়। এর মধ্যে রয়েছে ন্যায়পরায়ণতা, সংগতি বিধান ও পারস্পরিক সহনশীলতা, নারী-পুরুষ সমতা, অন্যের অধিকারের প্রতি শ্রদ্ধাবোধ ও সামাজিক দায়িত্ববোধ, সততা ইত্যাদি বিষয়ে লক্ষ্য রেখে গ্রেডিং করা যেতে পারে।

৬ষ্ঠ ও অষ্টম শ্রেণিতে শিক্ষার্থীদের বিদ্যালয়ভিত্তিক মূল্যযাচাই লিপিবদ্ধকরণ

কোর্স ওয়ার্ক ঃ সাময়িক-১

বিষয়: বিজ্ঞান শিক্ষা

শিক্ষার্থীর নাম	১. শ্রেণি অভীক্ষা				২. শ্রেণির কাজ		শ্রেণী ও ব্যবহারিক কাজ		৩. বাড়ির কাজ				৪. নির্ধারিত কাজ		৫. মৌখিক উপস্থাপনা		৬. দলগত কাজ		কোর্স ওয়ার্ক
	অভীক্ষা ১	অভীক্ষা ২	মোট নম্বর	**SBA** নম্বর	নম্বর	SBA নম্বর	নম্বর	SBA নম্বর	বাড়ির কাজ-১	বাড়ির কাজ-২	মোট নম্বর	SBA নম্বর	মোট নম্বর	SBA নম্বর	নম্বর	SBA নম্বর	নম্বর	এসবিএ নম্বর	মোট নম্বর
	১০	১০	২০	৫	৩৬	৫	৩৬	৫	১০	১০	২০	৫	১৫	৫	৩৬	৫	৩৬	৫	৩০
আকিলা রুবাইয়া	৮	৬	১৪	৩.৫	৩২	৫			৮	৮	১৬	৪	১২	৪	২৫	৪	২৫	৪	২৫
আশরাফ	৭	৮	১৫	৪	২৮	৪			৭	৭	১৪	৩.৫	১০	৩	৩২	৫	১৬	২	২৫
সাহিনুর	৫	৫	১০	২.৫			২৪	৩	৪	৪	৮	২	৬	২	১৬	২	৩২	৫	১৭

৩ = অতি উত্তম; ২ =উত্তম; ১ = ভাল
মৌখিক উপস্থাপনার মূল্যায়ন নিম্নলিখিতভাবে বিদ্যালয়ভিত্তিক SBA নম্বরে রূপান্তর করতে হবে:

৩০-৩৬ পয়েন্ট = ৫ নম্বর; ২৫-২৯ পয়েন্ট = ৪ নম্বর; ২০-২৪ পয়েন্ট = ৩ নম্বর

১৫-১৯ পয়েন্ট = ২ নম্বর; ১২-১৪ পয়েন্ট = ১ নম্বর।

দলীয় কাজের মত অন্যান্য কর্মতৎপরতা, যেমন- শ্রেণি অভীক্ষা, শ্রেণির কাজ, ব্যবহারিক কাজ, বাড়ির কাজ, নির্ধারিত কাজ পরিচালনা করে সে সব কাজের মূল্যযাচাই করে কীভাবে তা সংরক্ষণ ও ব্যবহার করা যেতে পারে, সে ব্যাপারে উপরোক্ত পদ্ধতি অনুসরণ করে যুক্তিসঙ্গত পদ্ধতি উদ্ভাবন করা যেতে পারে।

বিদ্যালয়ভিত্তিক মূল্যযাচাই (SBA) শিক্ষক নির্দেশনা:

শিক্ষার্থীদের কৃতিত্ব যাচাই যেন তাদের শেখার কাজকে সহায়তা করে এ নির্দেশনায় সে দিকটি বিশেষ বিবেচনা পেয়েছে। শিক্ষক নির্দেশিকা শিক্ষকদের কাজে সাহায্য করার প্রয়োজনেই প্রণীত হয়েছে। শিক্ষকদের যেসব জিজ্ঞাসা থাকতে পারে, সেসব জিজ্ঞাসা এতে দেয়া আছে। বিদ্যালয়ভিত্তিক মূল্যযাচাই সম্পর্কে স্পষ্ট ধারণা লাভ করে শিক্ষকগণ যাতে এটি সফলভাবে বাস্তবায়ন করতে পারেন সেদিকগুলো এতে বিশেষ বিবেচনা পেয়েছে।

SBA পদ্ধতি প্রবর্তন ও বাস্তবায়নের জন্য নিম্নোক্ত ব্যবস্থা গ্রহণ করা প্রয়োজন:

- বিদ্যালয়ের পরিদর্শন ব্যবস্থা জোরদার করা প্রয়োজন,
- শ্রেণিকক্ষে অনুকূল পরিবেশ সৃষ্টির জন্য শিক্ষার্থীদের মধ্যে শৃঙ্খলা ও শিক্ষকদের মধ্যে দায়িত্ববোধ সমন্বয়ের প্রয়োজনীয় ব্যবস্থা গ্রহণ করা,
- শিক্ষক নিয়োগে স্বচ্ছতা ও যোগ্য শিক্ষক নিয়োগের ব্যবস্থা করা প্রয়োজন,
- বিদ্যালয়ে শিক্ষাপোকরণ ও প্রয়োজনীয় আসবাবপত্রের ব্যবস্থা নিশ্চিত করা,
- শিক্ষকতা পেশায় মেধাবীদের উৎসাহী করার লক্ষ্যে বিদ্যমান বেতন কাঠামো সংস্কার করা প্রয়োজন,
- SBA পদ্ধতি প্রবর্তন ও ফলপ্রসূ করার জন্য শিক্ষার সকল স্তরের দুর্ণীতি মুক্ত প্রশাসন এবং জবাবদিহিতা নিশ্চিত করা গুরুত্বপূর্ণ,
- শিক্ষা প্রতিষ্ঠানের প্রধান এবং শ্রেণি শিক্ষকদের নিয়মিত বিদ্যালয়ে উপস্থিতি এবং শিক্ষাক্রমিক কার্যক্রমে অংশগ্রহণ নিশ্চিত করা।
- দেশের সকল স্তরে সুষম শিক্ষা ব্যবস্থা নিশ্চিত করার লক্ষ্যে শিক্ষার্থী অনুপাতে বিদ্যালয়ের ভৌত সুযোগ-সুবিধা নিশ্চিত করা প্রয়োজন।

স্কুলভিত্তিক মূল্যায়ন সার্থক করতে হলে ছাত্র ও শিক্ষক একসাথে আলোচনা করবেন ও কাঙ্ক্ষিত লক্ষ্যে পৌছানোর জন্য সকলে সচেষ্ট হলেই শিক্ষার প্রতি স্তরে বিদ্যালয় ভিত্তিক মূল্যযাচাই চালু করা সম্ভব হবে এবং এর সুফল প্রতিটি শিক্ষার্থীর শিক্ষা জীবনে তথা শিক্ষা ব্যবস্থায় বহু কাঙ্ক্ষিত ও যুগান্তকারী সাফল্য অর্জিত হবে।

মূল্যায়ন

১. বিদ্যালয়ভিত্তিক মূল্য যাচাই পদ্ধতি কী? এর উপাদানগুলো বর্ণনা করুন।

২. বিদ্যালয়ভিত্তিক মূল্য যাচাই পদ্ধতির সুবিধা ও অসুবিধাসমূহ লিখুন।

৩. বিদ্যালয়ভিত্তিক মূল্য যাচাই পদ্ধতির প্রতিবেদন প্রণয়ন পদ্ধতি বর্ণনা করুন।

সম্ভাব্য উত্তর

পর্ব-খ

সুবিধা	অসুবিধা
শিক্ষার্থীদের শ্রেণির কাজ, বাড়ির কাজ, ক্লাস টেস্ট, এ্যাসাইনমেন্ট ও বিভিন্ন শিখন দক্ষতা ইত্যাদি কার্যক্রমের মূল্যযাচাই সম্ভব হবে।	পক্ষপাতিত্বের সুযোগ সৃষ্টি হতে পারে।
শিক্ষকদের সামাজিক মর্যাদা বৃদ্ধি পাবে।	নীতিবান শিক্ষকদের নিরাপত্তা জনিত সমস্যা সৃষ্টি হতে পারে।
শিখন-শেখানো কার্যক্রমে শিক্ষক-শিক্ষার্থীর কর্মতৎপরতা বৃদ্ধি পাবে।	প্রাইভেট টিউশনি বজায় রাখার জন্য সংশ্লিষ্ট শিক্ষকগণ নিজের পছন্দের শিক্ষার্থীদের অধিক নম্বর প্রদান করতে পারে।
মূল্যায়ন ব্যবস্থায় নির্ভরযোগ্যতা, যথার্থতা বৃদ্ধি পাবে এবং পিছিয়ে পড়া শিক্ষার্থীরা বিশেষভাবে উপকৃত হবে।	অধিকাংশ ক্ষেত্রে কোন প্রকার মূল্যায়ন না করে কেবল অনুমানের ভিত্তিতে ৩০ শতাংশ নম্বর প্রদান করা হবে।
মূল্যযাচাইয়ের বিভিন্ন কলা-কৌশল বাস্তবে প্রয়োগ করার ফলে শিক্ষকের পেশাগত দক্ষতা বৃদ্ধি পাবে।	বেশি নম্বরের আশায় প্রাইভেট টিউশনির প্রতি শিক্ষার্থী ও অভিভাবকের ঝোঁক বাড়তে পারে।
বিদ্যালয়ে শিক্ষার্থীর উপস্থিতি বাড়বে এবং শিক্ষা গ্রহণে আগ্রহ বৃদ্ধি পাবে।	বেশির ভাগ শিক্ষকেরই শ্রেণিতে পাঠদান করার মত যথেষ্ট প্রশিক্ষণ না থাকার কারণে শ্রেণিকক্ষে ফাঁকি দেওয়ার প্রবণতা বৃদ্ধি পাবে।
শিক্ষার্থীরা পড়াশুনার ব্যাপারে সারা বছর ব্যস্ত থাকবে ফলে বিষয় সম্পর্কে পুরোপুরি জ্ঞান অর্জন সম্ভব হবে। পরীক্ষার আগে তাড়াহুড়া করে বেশি পড়ার চাপ কমে যাবে।	অভিভাকদের সাথে শিক্ষকের অসন্তোষ দৃষ্টি হতে পারে।
শুধু পরীক্ষার মাধ্যমে ফলাফল নির্ধারণের পরিবর্তে শিক্ষার্থীদের সারা বছরের কর্মকাণ্ডের মূল্যযাচাইয়ের ওপর এবং চূড়ান্ত পরীক্ষায় প্রাপ্ত নম্বরের সমন্বয়ে ফলাফল নির্ধারিত হবে।	কিছু কিছু সংশ্লিষ্ট শিক্ষক দুর্নীতির সুযোগ নিতে পারে।
মূল্য যাচাইয়ের বিভিন্ন কলাকৌশল বাস্তবে প্রয়োগ করার ফলে শিক্ষকের পেশাগত দক্ষতা বৃদ্ধি পাবে।	
মূল্যায়ন ব্যবস্থায় নির্ভরযোগ্যতা, যথার্থতা বৃদ্ধি পাবে এবং পিছিয়ে পড়া শিক্ষার্থীরা বিশেষভাবে উপকৃত হবে।	
শিক্ষক ও শিক্ষার্থীর মধ্যে আত্মিক ও বন্ধুত্বপূর্ণ সম্পর্ক গড়ে উঠবে।	
শিক্ষার্থীরা শিখন-শেখানো কার্যক্রমে অধিক সম্পৃক্ত হবে বলে মুখস্থ করার প্রবণতা কমে যাবে এবং পরীক্ষা ভীতি হ্রাস পাবে।	

পর্ব-গ

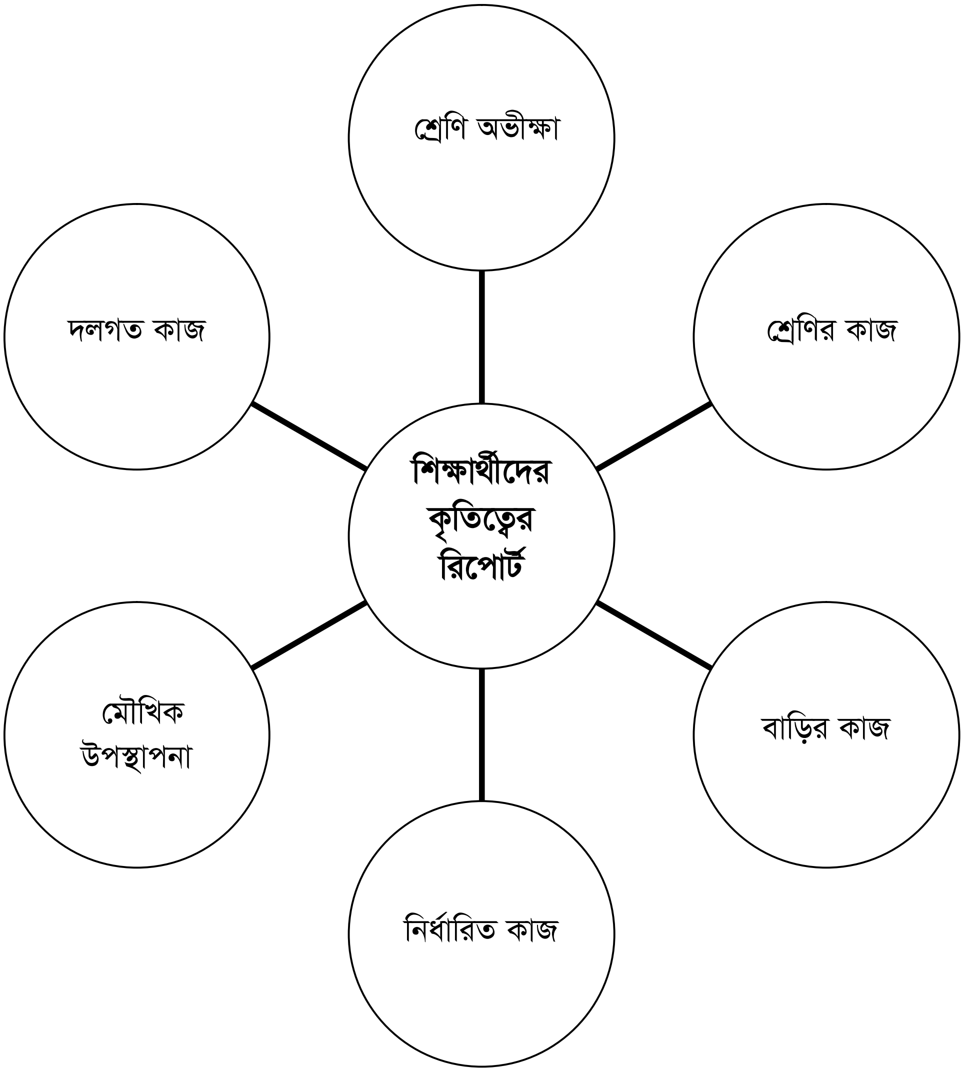
শ্রেণি অভীক্ষা
দলগত কাজ
শ্রেণির কাজ
শিক্ষার্থীদের কৃতিত্বের রিপোর্ট
মৌখিক উপস্থাপনা
বাড়ির কাজ
নির্ধারিত কাজ

সহায়ক গ্রন্থাবলী

১. শিক্ষা মনোবিজ্ঞান পরিচিতি, রওশন আরা বেগম ও অন্যান্য, বাংলাদেশ উন্মুক্ত বিশ্ববিদ্যালয়।

২. শিক্ষার মনোবৈজ্ঞানিক ভিত্তি, মাধ্যমিক শিক্ষা উন্নয়ন প্রকল্প, শিক্ষা মন্ত্রণালয়, ঢাকা।

৩. শিক্ষাশ্রয়ী মনোবিজ্ঞান, অরুণ ঘোষ, এডুকেশন এন্টারপ্রইজার্ম : কলিকাতা।

৪. শিক্ষার মনস্তাত্বিক ভিত্তি ও শিক্ষা নির্দেশনা, মুজিবর রহমান ও স্বপন কুমার ঢালী, মিতা ট্রেডার্স, ঢাকা।

৫. শিক্ষাক্রম উন্নয়ন : নীতি ও পদ্ধতি, মোঃ আবুল এহসান, ছাত্রবন্ধু লাইব্রেরী।

৬. মাধ্যমিক শিক্ষা, ড. দেলওয়ার হোসাইন শেখ কর্তৃক সম্পাদিত, মাধ্যমিক শিক্ষা উন্নয়ন প্রকল্প, শিক্ষা মন্ত্রণালয়, ২০০০।

৭. শিক্ষাক্রম প্রণয়ন ও মূল্যায়ন, ড. এম এ ওহাব মিয়া, বাংলা একাডেমী, ঢাকা।

৮. Curriculum Process - Dr, Siddiqur Rahman, Bishaw arichaya 37, Bangla Bazar, Dhaka

৯. জাতীয় শিক্ষাক্রম ও পাঠ্যপুস্তক বোর্ড (১৯৯৫), ঢাকা, শিক্ষাক্রম ও পাঠ্যসূচি, মাধ্যমিক স্তর (নবম-দশম শ্রেণি), রিপোর্ট ২য় খণ্ড।

১০. রিপোর্ট, মাধ্যমিক স্তরের শিক্ষাক্রম ও পাঠ্যসূচি (নবব-দশম শ্রেণি), জাতীয় শিক্ষাক্রম ও পাঠ্যপুস্তক বোর্ড, ১৯৯৫

১১. একমুখী শিক্ষাক্রম ২০০৫ (পরিমার্জিত), জাতীয় শিক্ষাক্রম ও পাঠ্যপুস্তক বোর্ড, মাধ্যমিক শিক্ষাক্রম শাখা, ২০০৪

১২. শিক্ষাক্রম ও পাঠ্যসূচি, মাধ্যমিক স্তর (নবম-দশম শ্রেণি) রিপোর্ট ২য় খণ্ড, এনসিটিবি, ১৯৯৫